রহস্য সমগ্র

বিকেলের মৃত্যু

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গলিইবুক.কম bengaliebook.com বেঙ্গলিইবুক.কম বেঙ্গলিইবুক.কম bengaliebook.com বেঙ্গলিইবুক.কম
2021

সূচিপত্র

১. সাহেবরা বলে লাঞ্চ, কেরানিরা বলে টিফিন 3
২. বাড়িটা এত ফাঁকা 16
৩. ববি রায় যেখানে গাড়িটা থামালেন 27
৪. বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন লীনা 38
৫. দুর্গাচরণ হাত বাড়িয়ে 53
৬. খাওয়া শেষ করে ববি রায় উঠলেন 65
৭. লীনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল 77
৮. ট্যাক্সিতে বসে ইন্দ্রজিৎ 89
৯. সোফায় একগুচ্ছ ফুল 101
১০. শেষ রাতে লীনার ঘুম হল 113
১১. পরাজয় স্বীকার 123
১২. একটা সিদ্ধান্ত 134
১৩. গভীর সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠা 145
১৪. বিকেলের ম্লান আলোয় 156
১৫. গলায় আনন্দের কাঁপন 167

১৬. একটা ট্র্যাংক কল 177
১৭. নীল মঞ্জিলের ঠিকানা 189
১৮. ক্ষতবিক্ষত শরীরে ববি 211

১. সাহেবরা বলে লাঞ্চ, কেরানিরা বলে টিফিন

সাহেবরা বলে লাঞ্চ, কেরানিরা বলে টিফিন। সে যাই হোক, ঠিক দুপুরবেলা একটু আলগা সময় পাওয়া যায়। এই সময়টা বসে বসে শশা, ছোলাসেদ্ধ আর টোস্ট খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ থাকে না লীনার। তার সিট ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। সাহেবের সেক্রেটারি হওয়ার অনেক ঝামেলা। বেশিক্ষণ দুরে, আউট অফ ইয়ারশট থাকার নিয়ম নেই, সব সময়েই একটা কঁটাওয়ালা চেয়ারে বসে থাকার মতো।

লীনা ঘড়ি দেখে টিফিন-টাইম শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে সবে তার স্টেনলেস স্টিলের টিফিন-বাক্সটা খুলেছে, এমন সময় ইন্টারকম বাজল।

সাহেবের গলা, একটু আসুন তো।

লীনা উঠে সুইং-ডোর খুলে ঢুকল। সাহেবের ঘরটা বিশাল বড়। দেয়াল থেকে দেয়াল অবধি মেজে জোড়া নরম মেজেন্টা রঙের কার্পেট। ইংরিজি এল অক্ষরের ছাদে মস্ত একটা টেবিল। ওপাশে গাঢ় সবুজ রঙের বড় রিভলভিং চেয়ার।

কিন্তু সাহেব অর্থাৎ ববি রায় অর্থাৎ কোম্পানির একনম্বর ইলেকট্রনিক ম্যাজিসিয়ান এবং দুনম্বর টপ বস চেয়ারে বসা অবস্থায় নেই। রোগা, কালো, মোটামুটি ছোটখাটো চেহাবার অস্থিরচিত্ত লোকটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। বাইরে বিশেষ কিছু দেখার নেই। এয়ার কন্ডিশনের জন্য কাচে আঁটা জানালা। ওপাশে একটা সরু রাস্তার পরিসর, তারপর আবার বাড়ি। বাড়ি আর বাড়িতে চারদিক কণ্টকিত এই মিডলটন স্ট্রিটে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকার মানেই হয় না।

ইয়েস স্যার।

ববি রায় ফিরে তাকালেন। সকাল থেকে এই অবধি বার চারেক দেখা হয়েছে। চারবারের কোনওবারই মুখে মেঘ ছিল না। এখন আছে। ববি রায় হচ্ছেন সেই মানুষ, যাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে তার কাজ, তার কম্পিউটার ও অন্যান্য অত্যাশ্চর্য যন্ত্রপাতি, তিনি এতই খ্যাতিমান যে তাকে একবার লন্ডন থেকে একরকম কিডন্যাপ করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ববি রায়ের যেতে হয় আমেরিকা থেকে শুরু করে চিন-জাপান অবধি। কখনও শিখতে, কখনও শেখাতে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ববি রায় নিশ্চয়ই কোম্পানির কাছ থেকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা বেতন বাবদ পান, আরও কয়েক লক্ষ টাকা কোম্পানি হাসিমুখে বহন করে টুর বাবদ। ববি রায় বোধহয় আজও ভেবে ঠিক করতে পারেননি যে, এত টাকা দিয়ে তিনি প্রকৃতই কী করবেন। কোম্পানি তাঁকে লবণ হ্রদে বিশাল বাড়ি করে দিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য গাড়ি এবং দিন-রাতের জন্য দু'জন শফার, কলকাতার সর্বোত্তম নার্সিং হোমে পুরো পরিবারের কোম্পানির খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, টেলিফোন বা ইলেকট্রিকের বিল, গাড়ি সারানোর খরচ কিছুই ববি রায়ের পকেট থেকে যায় না। কোম্পানি তাকে শুধু দেয় আর দেয়। কোম্পানি বোকা নয়। ববি রায়ও কোম্পানিকে তেমন কিছু দেন যা কোটি কোটি টাকার দরজা খুলে দিচ্ছে, উন্মোচিত করছে নতুন নতুন দিগন্ত।

দ্বিতীয়বার লীনাকে বলতে হল, স্যার, কিছু বলছিলেন?

বসুন।–গলাটা গম্ভীর।

লীনা অবাক হল। তাকে কখনও ববি রায় বসতে বলেননি।

লোকটার জন্ম ফরাসি দেশে, ভারতীয় দূতাবাসের অফিসার বাবার সূত্রে। জীবনের প্রথম বিশটা বছর কেটেছে বিদেশে। সুতরাং লোকটা যে ভাল বাংলা জানবে না এটা বলাই বাহুল্য। ববি রায় কদাচিৎ মাতৃভাষা বলেন। এবং বলেন অনেকটা সাহেবদের বাংলা বলার মতোই।

বস হিসেবে লোকটা ভাল না মন্দ তা আজও বুঝতে পারেনি লীনা। মাত্র তিন মাস আগে সে এই অতি বৃহৎ মাল্টি-ন্যাশনালে বরাতের জোরে চাকরিটা পেয়ে গেছে। তবে তিন মাসে সে এটা লক্ষ করেছে যে, ববি রায়ের তাকে খুব কমই প্রয়োজন হয়। ববি বছরে বার দশেক বিদেশে যান। ববি রায় ডিকটেশন দেওয়া পছন্দ করেন না। নিজের কাজ ছাড়া বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে লোকটি নিতান্তই অজ্ঞ। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই বিপুল পড়াশুনোর চাপে লোকটির ইলুপ্তি ঘটতে চলেছে। প্রবল রকম অন্যমনস্ক। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা চোখে পড়ে, তা হল লোকটার এক অবিরল অস্থিরতা। লীনা দেখেছে, লোকটা কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে বার বার উঠে পড়েন, টেবিলের উপর রাখা ছাইদানি, পেনসিল বক্স, এটা ওটা বার বার এধার ওধার করেন, বার বার চুলে। হাত বোলান, নিজের কান টানেন, নাকের ডগাটা মুঠো করে চেপে ধরেন। এত দায়িত্বশীল এবং উচ্চ পদে আসীন কোনও মানুষের পক্ষে এই অস্থিরতা একটু বেমানান।

এখন ববি রায়কে আরও একটু অস্থির দেখাচ্ছিল। লীনাকে বসতে বলে তিনি চেয়ারের পিছনে অনেকটা পরিসর জুড়ে চঞ্চল এবং দ্রুত পায়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে দু'হাতের মুঠোয় মাথার চুলগুলো চেপে ধরলেন। সিলিং-এর দিকে চোখ।

লীনার মনে হল, এই চঞ্চলমতি লোকটি এইভাবেই চুল টেনে টেনে নিজের মাথায় প্রায় টাক ফেলে দিয়েছেন।

হঠাৎ ববি রায় লীনার দিকে তাকিয়ে অতিশয় বিরক্তির গলায় প্রশ্ন করলেন, হোয়াই গার্লস?

লীনা একেবারে ভোম্বল হয়ে চেয়ে রইল। লোকটা বলে কী রে?

এবার লীনার ফোঁস করার মতো অবস্থা হল। লোকটা বোধহয় তাকে এবং মহিলা সমাজকে অপমান করতে চায়। সে মেরুদণ্ড সোজা করে এবং মুখটা যথেষ্ট ওপরে তুলে বলল, আই ফাইন্ড মেন মোর ডিসগাস্টিং মিস্টার রয়। প্লিজ ওয়াচ হোয়াট ইউ সে।

ববি রায় তেমনি শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। লীনার কথাটা বুঝতে পেরেছেন বলেই মনে হল না। কিন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং অস্বচ্ছন্দ বাংলা বললেন, আপনার মেয়ে হওয়ার কী দরকার ছিল? আঁ! হোয়াই আই অলওয়েজ গেট এ গার্ল অ্যাজ সেক্রেটারি?

এরকম প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে লীনা খুব দুরূহ কল্পনাতেও তা আন্দাজ করতে পারে না। এত অবাক হল সে যে জুতসই দূরের কথা, কোনও জবাবই দিতে পারল না।

ববি রায় আচমকা লীনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং পিছন ফিরে সোজা জানালা বরাবর হেঁটে যেতে যেতে বললেন, ইট গিভস মি ক্রিপস হোয়েনএভার দেয়ার ইজ এ গার্ল ডুয়িং মেনস জব।

লীনা এবার যথেষ্ট উত্তপ্ত হল এবং সপাটে বলল, ইউ আর এ মেল-শৌভিনিস্ট। ইউ আর এ- এ...

ববি রায়কের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজের প্রস্তরমূর্তির মতো। মিনিটখানেক শব্দহীন।

লীনা উঠতে যাচ্ছিল। লোকটাকে তার এত খারাপ লাগছে!

প্রস্তরমূর্তির থেকে আচমকাই লোকটা ফের স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো ঘুরে দাঁড়ালেন। কী যেন বিড় বিড় করে বকছেন, শোনা যাচ্ছে না। পৃথিবীর মহিলাদের উদ্দেশে কটুকাটব্য নয় লে? হয়তো খুবই অশ্লীল সব শব্দ! লীনা কণ্টকিত হল রাগে ক্ষোভে এবং অপমানে।

এখন কি তারও উচিত পৃথিবীর অকৃতজ্ঞ পুরুষজাতির উদ্দেশে বিড়বিড় করে কটুকাটব্য করা? কী করবে লীনা? এই অপমানের একটা পালটি নেওয়া যে একান্তই দরকার।

ববি আবার অতি দ্রুত পায়ে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। তারপর টেবিলটার কোণের দিকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। টক করে একটা সুইচ টিপলেন। টেবিলের ওই অংশটায় একটা ভিডিয়ো ইউনিট লুকোনো আছে, লীনা জানে। কমপিউটারের সঙ্গে যুক্ত এই ইউনিটটা বিস্তর তথ্যে ভরা আছে। কিন্তু ববি কী চাইছেন তা লীনা বুঝতে পারছে না।

স্প্রিং-এ ভর দিয়ে খুদে ইউনিটটা ডুবুরির মতো উঠে এল ওপরে।

ববি অতি দ্রুত অভ্যস্ত আঙুলে চাবি টিপলেন। পরদায় ঝিক করে ফুটে উঠল একটা ফটো। নীচে নাম, লীনা ভট্টাচার্য। আবার চাবি টিপলেন ববি। পরদায় হরেক নম্বর আর অক্ষর ফুটে উঠতে লাগল যার মাথামুন্ডু লীনা কিছুই জানে না। সম্ভবত কোড।

ববি ভ্রু কুঁচকে খুব বিরক্তির চোখে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে ছিলেন। কী দেখলেন উনিই জানেন। তবে মুখখানা দেখে মনে হল, যা দেখলেন তাতে মোটেই খুশি হলেন না।

অপমানের বোধ লীনার প্রবল। কারও বায়োডাটা বা ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস তার সামনেই চেক করা কতদূর অভদ্রতা এই লোকটা তাও জানে না। কিংবা ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করতে চাইছে লোকটা!

ববি রায় সুইচ টিপে ভিডিয়ো বন্ধ করে দিলেন এবং সেটা আবার ডুবে গেল টেবিলের তলায়। ববি রায় মাথা নেড়ে বললেন, দেখা যাচ্ছে একমাত্র মোটরগাড়ি চালাতে জানা ছাড়া আপনি আর তেমন কিছুই জানেন না।

এই নতুন দিক থেকে আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না লীনা। আজ লোকটার হল কী? মাথা-টাথা গন্ডগোল হয়ে যায়নি তো! এইসব উইজার্ডরা পাগলামির সীমানাতেই বাস করে।

প্রতিভাবানদের মধ্যে অনেক সময়েই পাগলামির লক্ষণ ভীষণ প্রকট।

কিন্তু কথা হল, লোকটার এত বড় বড় কাজ থাকতে হঠাৎ লীনাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার পড়ল?

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্থির করল। প্রতি-আক্রমণ করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন নিজেকে সংহত, একমুখী ও গনগনে করে তোলা। লীনা একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, মিস্টার বস,

কিন্তু ববি তার কথা শোনার জন্য মোটেই আগ্রহী নন। তিনি উদভ্রান্তের মতো ফের জানালা কাছে চলে গেলেন। হাতটা ওখান থেকেই তুলে লীনাকে চুপ থাকবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর পুরো এক মিনিট নীরবতা পালন করে রে দাঁড়ালেন।

মিসেস ভট্টাচারিয়া, গাড়ি চালানোর রেকর্ডও আপনার খুব খারাপ। গত এক বছরে তিনটে পেনাল্টি। ভোর ব্যাড। আপনার দাদা একজন এক্স-কনভিক্ট। ইউ লাভ পোয়েট্রি অ্যান্ড মিউজিক। দ্যাটস অফুল। হরিবল। ইউ হ্যাভ ইমোশন্যাল ইনভলভমেন্ট উইথ এ ভ্যাগাবন্ড।

পর পর বজ্রাঘাত হলেও বোধহয় এর চেয়ে বেশি স্তম্ভিত হত না লীনা। তার সমস্ত শরীরটা যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল অপমানে। এমনকী সে মুখ পর্যন্ত খুলতে পারছে না। মনে হচ্ছে, লক জ।

ববি চড়াই পাখির মতো চঞ্চল পায়ে ফের জানালার কাছে চলে গেলেন।

লীনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।

দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে সে বলল, ইউ আর এ স্কাউন্ড্রেল মিস্টার রয়। এ ডাউনরাইট স্কাউন্ড্রেল। আই অ্যাম লিভিং।

ববি রায় কথাটা শুনতে পেলেন বলে মনেই হল না। কোনও বৈলক্ষণ নেই। প্রস্তরমূর্তির মতো আবার নীরবতা।

লীনার শরীর এত কাঁপছিল যে, দরজা অবধি যেতে পারবে কি না সেটাই সন্দেহ হচ্ছে।

ভারী দরজাটা খুলে লীনা প্রায় টলে পড়ে গেল নিজের চেয়ারে বসে খানিকক্ষণ দম নিল। শরীর জ্বলছে, বুক জ্বলছে, মাথা জ্বলছে। কিছুক্ষণ সে কিছু ভাবতে পারল না। টাইপরাইটারে একটা রিপোর্ট অর্ধেক টাইপ করা ছিল। সেটা টেনে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল লীনা। নতুন দুটো কাগজ কার্বন দিয়ে লোড করল। ইস্তফাপত্র।

কী-লোর্ডে আঙুল তুলতে গিয়েও থমকে গেল লীনা। কী বলছিল লোকটা? গাড়ি চালানোতে তিনবার পেনাল্টি? দাদা এক্স-কনভিক্ট? কবিতা ও গানের প্রতি আসক্তি? একজন ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে

প্রেম?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এসব খবর একে কে দিয়েছে। পুলিশও তো এত কিছুর খোঁজ নেয় না কোনও সরকারি কর্মচারীর! এ লোকটা জানল কী করে?

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল লীনা। কী করবে? গিয়ে লোকটার কলার চেপে ধরবে? কী করে জানলেন আপনি এত কথা? আর কেনই বা?

ইন্টারকমটা পি করে বেজে উঠল। লীনা ঘৃণার সঙ্গে তাকাল টেলিফোনটার দিকে। ববি রায় আর কী চায়? আরও অপমানের কিছু বাকি আছে নাকি?

লীনা একবার ভাবল ফোনটা ধরবে না। তারপর ধরল। অত্যন্ত খর গলায় সে বলল, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। আই অ্যাম লিভিং।

ববি রায় কিছু বললেন না প্রথমে। নীরবতা। গিমিক?

লীনা টেলিফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ববি রায়ের গলা শোনা গেল, একবার ভিতরে আসুন।

না। যথেষ্ট হয়েছে।

খুব ক্লান্ত গলায় ববি বললেন, গার্লস আর সেম এভরিহোয়ার। নেভার সিরিয়াস। অলওয়েজ ইমোশন্যাল।

আপনি মেয়েদের কিছুই জানেন না।

হতে পারে। কিন্তু কথাটা জরুরি। খুব জরুরি।

আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

প্লিজ।

লীনা ঝাং করে ফোনটা রেখে দিল। একবার ভাবল, যাবে না। তারপর মনে হল, শেষবারের মতো দেখেই যায় ব্যাপারটা।

ববি রায়ের ঘরে ঢুকে লীনা দেখল, প্রশান্ত মুখে লোকটা চেয়ারে বসে আছে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। কিন্তু অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা কিছু বলার আগেই লীনা বলল, আপনার কম্পিউটারে আমার সম্পর্কে কয়েকটা ভুল ইনফরমেশন ফিফড করা আছে। প্রয়োজন মনে করলে শুধরে নেবেন। প্রথম কথা, আমি মিসেস নই, মিস। আমার দাদা এক্সকনভিক্ট নন, পোলিটিক্যাল প্রিজনার ছিলেন। আর ভ্যাগাবন্ড

ববি রায় হাত তুলে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন লীনাকে। তারপর বললেন, ইররেলেভেন্ট।

আমি জানতাম না যে, আপনারা আমার পিছনে স্পাইং করেছেন। জানলে কখনও এই কোম্পানিতে জয়েন করতাম না।

ববি রায় অত্যন্ত উদাসীন চোখে চেয়ে ছিলেন লীনার দিকে। বোঝা যাচ্ছিল, লীনার কথা তিনি আদৌ শুনছেন না।

আচমকা লীনার কথার মাঝখানে ববি রায় বলে উঠলেন, ইট ইজ অ্যাবসোলিউটলি এ ম্যানস জব।

তার মানে?

ববি রায় নির্বিকারভাবে সামনের দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু আর তো সম্ভব নয়। সময় এত কম! আপনি একটা কাজ করবেন মিস্টার রয়?

উঃ?

আপনি ইমিডিয়েটলি কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে দেখা করুন। ইউ আর নট উইদিন ইয়োরসেলফ।

ববি রায় লীনার দিকে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে বললেন, না, অত সময় নেই। টাইম ইজ দি মেইন ফ্যাক্টর। দে উইল স্ট্রাইক এনি মোমেন্ট নাউ। নো ওয়ে। নাথিং ডুয়িং।

ইউ হ্যাভ গন আউট অফ ইয়োর রকার।

ববি রায় মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে লীনার কথাটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর আকস্মিকভাবে বললেন, মিসেস ভট্টাচারিয়া–

লীনার প্রতিবাদে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল। তবু সে কণ্ঠ সংযত রেখে বলল, মিসেস নয়, মিস।

মে বি, মিস ভট্টাচারিয়া, আপনি কি বিশ্বাসযোগ্য?

লীনা ডান হাতে কপালটা চেপে ধরে বলল, ওঃ, ইউ আর হরিবল। প্র

শ্নটা খুবই গুরুতর। আপনি কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য?

লীনা বাঙ্গ করে বলল, আপনার কম্পিউটার কী বলে?

কম্পিউটার বলছে, ইট ইজ অ্যাবসোলিউটলি এ ম্যানস জব।

হোয়াট জব?

আপনি মোটরবাইক চালাতে জানেন?

না।

ক্যান ইউ রান ফাস্ট?

জানি না।

আপনি কি সাহসী?

আপনার কম্পিউটারকে এসব জিজ্ঞেস করুন।

কম্পিউটারের ওপর রাগ করে লাভ নেই। কাজটা জরুরি। আপনি পারবেন?

লীনার রাগটা পড়ে আসছিল। হঠাৎ তার মনে হল, ববি রায় তাকে সত্যিই কিছু বলতে চাইছেন। কাজটা হয়তো-বা জরুরিও।

লীনা ববি রায়ের দিকে চেয়ে বলল, আপনি সংকেতে কথা বললে আমার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

ববি রায় কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে লীনার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, এখানে নয়। উই মে মিট সামহোয়্যার আউটসাইড দিস অফিস।

তার মানে?

ববি রায় টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে বসে বললেন, ওরা এ ঘরে দুটো বাগ’ বসিয়ে রেখেছিল।

বাঘ?

বাঘ! আরে না। বাগ মানে স্পাইং মাইক্রোফোন। ইলেকট্রনিক।

ওঃ।

আমি দুটো রিমুভ করেছি। কিন্তু আরও দু’-একটা থাকতে পারে। এখানে কথা হবে না।

লীনা ভয়ে বলল, কারা বসিয়েছিল?

জানি না। তবে দে নো দেয়ার জব।

আমাকে কী করতে হবে তা হলে?

একটা জায়গা ঠিক করুন। আজ বিকেল পাঁচটার পর–

না। আমার থিয়েটারের টিকিট কাটা আছে।

ববি থমকে গেলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর মানুষটার মুখে এক আশ্চর্য হাসি ফুটল। ববিকে কখনও কোনও দিন হাসতে দেখেনি লীনা। সে অবাক হয়ে দেখল, লোকটার হাসি চমৎকার। নিষ্পাপ, সরল।

পরমুহূর্তেই হাসিটা সরিয়ে নিলেন ববি। খুব শান্ত গলায় বললেন, যাবেন। আফটার দি ফিউনারেল।

তার মানে?

আজকের থিয়েটারটা আপনাকে স্কিপ করতে অনুরোধ করছি। যে-কোনও সময়েই ওরা আমাকে খুন করবে। সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমি অনেকদিন ধরেই এসব বিপদ নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু দেয়ার ইজ সামথিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইমিডিয়েটলি আফটার মাই ডেথ।

লীনা এত ভয় খেয়ে গেল যে চোখের পাতা ফেলতে পারল না। লোকটা কি সত্যিই পাগল?

ববি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে বলুন তো! না, দাঁড়ান। এ ঘরে কথা বলাই ভাল। আপনি একটা কাজ করুন। আমাকে আপনার চেনা জানা কারও ফোন নম্বর একটা কাগজে লিখে দিন, আর আপনি সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। এখন আড়াইটে বাজে। আমি আপনাকে সাড়ে তিনটে নাগাদ ফোন করব।

ব্যাপারটা একটু ড্রামাটিক হয়ে যাচ্ছে না তো?

হচ্ছে। রিয়াল লাইফ ড্রামা। কিন্তু সময় নষ্ট করবেন না। যান।

লীলা উঠল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমার রেজিগনেশন লেটারটা- ?

ববি রায় আবার হাসলেন। বললেন, আই অ্যাম রাইটিং মাই ডেথ সেনটেন্স।

লীনা বেরিয়ে এল। ব্যাগ গুছিয়ে নিল। তারপর টেলিফোন নম্বরটা একটা চিরকুটে লিখে যখন ববির ঘরে ঢুকল তখন ববি টেবিলে মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন।

মিস্টার রায়।

ববি মাথা তুললেন না। শুধু হাতটা বাড়ালেন। ভুতুড়ে ভঙ্গি।

লীনা চিরকুটটা হাতে দিতেই হাতটা মুঠো হয়ে গেল।

লীনা করিডোরে বেরিয়ে এল। দু'ধারে বড় অফিসারদের চেম্বার। লাল কার্পেটে মোড়া করিডোর ফাঁকা। দু'-একজন বেয়ারাকে এধার-ওধার করতে দেখা যাচ্ছে। পিতলের টবে বাহারি গাছ।

কেমন গা শিরশির করল লীনার। লিফটে নেমে সে একটা ট্যাক্সি নিল। তারপর সোজা হাজির হল তার বাড়িতে। টেলিফোনের কাছাকাছি চেয়ার টেনে অপেক্ষা করতে লাগল।

ফোনটা এল ঘণ্টাখানেক পর।

মিসেস ভট্টাচারিয়া–

মিসেস নয়, মিস।

কোথায় মিট করব বলুন তো!

রাস্তায়। গড়িয়াহাট রোড আর মেফেয়ার রোডের জংশনে। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।

গুড। ভেরি গুড। পাঁচটায় তা হলে?

হ্যাঁ।

লীনার মনে পড়ল, ববি যখন হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা নিয়েছিলেন তখন হাতটা একটু কাঁপছিল।

২. বাড়িটা এত ফাঁকা

বাড়িটা এত ফাঁকা, এত ধু ধু ফাঁকা যে লীনার কাপ ডিশ ছুড়ে ভাঙতে ইচ্ছে করে।

বেসিনে গিয়ে সে দু’ হাত ভরে জল নিয়ে চোখে মুখে প্রবল ঝটকা দিচ্ছিল। মাথাটা ভোম হয়ে আছে, কান জ্বালা করছে, মনটা কাঁদো কাঁদো করছে। কোনও মানে হয় এর?

লোকটা যে বিটকেল রকমের পাগল তাতে সন্দেহ আছে কোনও? লীনাকে ভয়-টয় খাইয়ে একটা ম্যাসকুলিন আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছে না তো? না কি প্র্যাকটিক্যাল জোক? রঙ্গ-রসিকতার ধারে কাছে বাস করে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু ববি রায় যে একটু চন্দ্রাহত তাতে সন্দেহ নেই।

লীনাদের বাড়িটা দোতলা। গোটা আষ্টেক ঘর। একটু বাগান আছে। এ বাড়িতে প্রাণী বলতে তারা এখন তিনজন। মা, বাবা আর লীনা। দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না। শুধু রাখাল আর বৈষ্ণবী। তারাই কেয়ারটেকার, তারাই ঝি চাকর, রাঁধুনি। বয়স্কা স্বামী-স্ত্রী, নিঃসন্তান। একতলার পিছন দিকের একখানা ঘরে তারা নিঃশব্দে থাকে। ডাকলে আসে, নইলে আসে না। নিয়ম করে দেওয়া আছে।

শরৎ শেষ হয়ে এল। দুপুরেও আজকাল গরম নেই। রাত্রে একটু শীত পড়ে আর উত্তর দিক থেকে হাওয়া দেয়। লীনা মস্ত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল, ঘাড় মুছল। ঠান্ডা জলের প্রতিক্রিয়ায় গা একটু শিরশির করছে।

ঘড়িতে পৌনে চারটে। পাঁচটার সময় ববি রায়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। থিয়েটার শুরু হবে সাড়ে ছ’টায়। দেড় ঘণ্টা সময় হাতে থাকছে। তা হলে পাগলা ববি কেন তাকে থিয়েটার বাদ দিতে বলছে?

কে জানে বাবা, লীনা কিছু বুঝতে পারছে না।

দোলন এসে অ্যাকাডেমিতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে তার জন্য। দোলনের ফোন নেই। দোলনকে খবর দেওয়ার কোনও উপায় নেই। সিমলের মোড়ে গদাইয়ের চায়ের দোকানে খবর দিয়ে রাখলে সেই খবর দোলন পায়। কিন্তু এখন সেই সিমলে অবধি ঠ্যাঙাবে কে? একটা গাড়ি থাকলেও না হয় হত।

গাড়ি যে নেই এমনও নয়। দু'-দুখানা গাড়ি তাদের। পুরনো অ্যাম্বাসাডারটা তো ছিলই। সম্প্রতি মারুতিটা এসেছে। কিন্তু সে দু'খানা তার মা আর বাবার। দুজনেই জবরদস্ত কাজের লোক। লীনার একদা বিপ্লবী দাদা বিপ্লব করতে না-পেরে টাকা রোজগারে মন দিয়েছিল। ভাল ইঞ্জিনিয়ার সে ছিলই। ব্যাবসা করতে নেমেই টুকটাক নানা যোগাযোগে এত দ্রুত বড়লোক হতে লাগল যে, এ বাড়িতে বাপ আর ছেলের মধ্যে শুরু হয়ে গেল চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সোরাব-রুস্তম। তারপর দাদা বিয়ে করল, বিশাল বাড়ি হাঁকড়াল এবং বাপ-মা-বোনকে টা-টা গুডবাই করে চলে গেল। দাদার বোধহয় তিন-চারখানা গাড়ি। একদা-বিপ্লবীকে এখন পেয়েছে এক সাংঘাতিক টাকার নেশা। হিংস্র, একবোখা, কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্থোপার্জন। সেই ভয়ংকরী আকর্ষণের কাছে দুনিয়ার আর সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন তো দূরের কথা, নিজের বউ-বাচ্চার প্রতিও তার কোনও খেয়াল নেই। বিশাল বিশাল কনস্ট্রাকশনের কাজ নিয়ে কলকাতা থেকে সৌদি আরব পর্যন্ত পাড়ি দিচ্ছে। দেশ-বিদেশ ঘুরছে পাগলের মতো। বিপ্লবী দাদাকে পাগলের মতো ভালবাসত লীনা, কিন্তু এই দাদাকে সে চেনেই না।

দাদার কাছে গাড়ি চাইলেই পাওয়া যাবে। লীনা জানে। কিন্তু চাওয়ার উপায় নেই। বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র করবে। কী করে যে দোলনকে একটা খবর দেওয়া যায়! ট্যাক্সির কোনও ভরসা নেই। আর উত্তর কলকাতায় যা জ্যাম! এখন বেরোলে পাঁচটার মধ্যে ফেরা যাবে কি না সন্দেহ।

লীনা এক কাপ চা খেল। তারপর হলঘরের ডিভানে শুয়ে একখানা ইংরিজি থ্রিলার পড়ার চেষ্টা করল। হল না।

বাড়িটা বড্ড খাঁ খাঁ করছে। যতদিন দাদা ছিল এত ফাঁকা লাগত না। এ বাড়ির লোকেরা শুধু টাকা চেনে। শুধু টাকা। তার বাবারও ওই এক নেশা। দিন রাত টাকা রোজগার করে যাচ্ছে। তারও মস্ত ব্যাবসা কেমিক্যালসের। মা পর্যন্ত বসে নেই। মেয়েদের জন্য একটা এক্সক্লুসিভ ইংরিজি ম্যাগাজিন বের করেছে। তাই নিয়ে ঘোরর ব্যস্ত।

এদের কারও সঙ্গেই সম্পর্ক রচনা করে তুলতে পারেনি লীনা। ছেলেবেলা থেকেই সে এই ব্যস্ত মা বাবার কাছে অবহেলিত। নিজের মনে সে বড় হয়েছে। ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও যে কতখানি শুন্যতা একজনকে ঘিরে থাকতে পারে তা লীনার চেয়ে বেশি আর কে জানে? এমনকী ওই যে ভ্যাগাবন্ড দোলন, সেও এই শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে না। গরিবের ছেলে বলে নানা কমপ্লেকস আছে। হয়তো মনে মনে লীনাকে একটু ভয়ও পায়। বেচারা!

লীনা চাকরি নিয়েছে টাকার প্রয়োজনে তো নয়। এই আট ঘরের ফাঁকা বাড়ি তাকে হানাবাড়ির মতো তাড়া করে দিন রাত। সকাল-সন্ধে মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয় দেখা না-হওয়ার মতোই। দু'জনেই নিজের চিন্তায় আত্মমগ্ন, বিরক্ত, অ্যালুফ। সামান্য কিছু কথাবার্তা হয় ভদ্রতাবশে। যে যার নিজস্ব বলয়ের মধ্যে বাস করে। লীনা ইচ্ছে করলে বাবার কোম্পানিতে, দাদার কনসার্নে বা মায়ের ম্যাগাজিনে চাকরি করতে পারত। ইচ্ছে করেই করেনি। গোমড়ামুখো মা-বাবার সংশ্রবের চেয়ে অচেনা বস বরং ভাল।

কপাল খারাপ। লীনা এমন একজনকে বস হিসেবে পেল, যে শুধু গোমড়ামুখোই নয়, পাগলও।

ওয়ার্ডরোব খুলে লীনা ড্রেস পছন্দ করছিল। দেশি, বিদেশি অজস্র পোশাক তার। সে অবশ্য আজকাল তাঁতের শাড়িই বেশি পছন্দ করে।

বেছে-গুছে আজ সে জিনস আর কামিজই বেশি পছন্দ করল।

সাজতে লীনার বিশেষ সময় লাগে না। মোটামুটি সুন্দরী সে। রূপটান সে মোটেই ব্যবহার করে। মুখে একটু ঘাম-তেল ভাব থাকলে তার মুখশ্রী ভাল ফোটে, এটা সে জানে। পায়ে একজোড়া রবার সোলের সোয়েডের জুতো পরে নিল। গয়না সে কখনওই পরে না, ঘড়ি পরে শুধু।

হাতে পনেরো মিনিট সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়বে লীনা। ওল্ড বালিগঞ্জ থেকে হেঁটে যেতে দশ মিনিটের মতো লাগবে। সে একটু আস্তে হাঁটবে বরং।

ব্যাগ থেকে একটা চুয়িংগাম বের করে মুখে পুরে নিল লীনা। কাঁধে ব্যাগ। বেরোবার জন্য ঘড়িটা দেখে নিল। আরও দু'মিনিট। বুকটা কি একটু কাঁপছে?

দুর্বলতা বা নার্ভাসনেস দূর করতে সবচেয়ে ভাল উপায় হল একটু ব্রিদিং করা। তারপর শবাসন। শরীর ফিট রাখতে লীনাকে অনেক যোগব্যায়াম আর ফ্রি হ্যান্ড করতে হয়েছে। এখনও করে।

লীনা বাইরের ঘরে সোফায় পা তুলে পদ্মাসনে বসে গেল। কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে ব্রিদিং করে নিল। ঠিক দুমিনিট।

বাইরে রোদের তেজ মরে এসেছে। বেলা গুটিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। লীনা কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে হাতে দোলাতে দোলাতে হাঁটতে লাগল।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে লীনা দাঁড়াল। এ তার চেনা জায়গা। গোটা অঞ্চলটাই তার চেনা। ছোট থেকে এইখানেই সে বড় হয়েছে।

লীনা দাঁড়িয়ে রইল। সময় বয়ে যেতে লাগল। টিকটিক টিকটিক।

পাঁচটা।... পাঁচটা দুই।... পাঁচটা পাঁচ।... পাঁচটা দশ। পাঁচটা পনেরো।

লীনা ঘড়ি দেখল। না, তার কোনও দায় নেই অপেক্ষা করার। সময় ববি দিয়েছিলেন। ববি কথা রাখেননি।

সুতরাং লীনা এখন যেখানে খুশি যেতে পারে।

থিয়েটার সাড়ে ছ'টায়। হাতে এখনও অনেক সময় আছে। লীনা ফিরে গিয়ে বাড়ি থেকে কিছু একটা খেয়ে আসতে পারে। খিদে পাচ্ছে।

লীনা ফিরল। নির্জন রাস্তাটা ধরে সামান্য ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে লাগল। পিছনে বড় রাস্তা থেকে যে কালো গাড়িটা মোড় নিল সেটাকে লক্ষ করার কোনও কারণ ছিল না লীনার।

মসৃণ গতিতে সমান্তরাল ছুটে এল গাড়িটা। নিঃশব্দে।

লীনা কিছু বুঝবার আগেই প্রকাণ্ড বিদেশি গাড়িটার সামনের দরজা খুলে গেল। একটা হাত বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এসে লীনার ডান কবজিটা চেপে ধরল। সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই চকিত আকর্ষণে তাকে টেনে নিল ভিতরে।

আঁ-আঁ-আঁ–

চেঁচাবেন না। প্লিজ।

আ-আপনি?

লীনা তালগোল পাকানো অবস্থা থেকে শরীরটাকে যখন সোজা ও সহজ করল গাড়িটা আবার বাঁয়ে ফিরে অন্য রাস্তা ধরেছে। স্টিয়ারিং হুইলে এক এবং অদ্বিতীয় সেই পাগল। ববি রায়।

এর মানে কি মিস্টার রায়?

প্রিকশন।

তার মানে?

আমি কি মানে- বই?

তার মানে?

আপনার মাথায় গ্রে-ম্যাটার এত কম কেন?

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আপনার আই-কিউ কেন জিরো?

ববি রায় গাড়িটায় বিপজ্জনক গতি সঞ্চার করে বললেন, আইনস্টাইনের আই-কিউ কত ছিল জানেন?

না।

আমিও জানি না। তবে মনে হয় জিরোই। জিনিয়াসদের আই-কিউ দরকার হয় না। আই-কিউ দরকার হয় তাদের, যারা কুইজ কনটেস্টে নামে।

আপনি কি জিনিয়াস?

অকপটে বলতে গেলে বলতেই হয় আমার মাথার দাম আছে। এ কস্টলি 'হেড মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনার মাথায়-

মিসেস নয়, মিস।

ওই একই হল। আপনার মাথায় গ্রে-ম্যাটার খুব কম।

আপনি গাড়ি থামান। আমি নেমে যাব।

ববি রায় জবাব দিলেন না! পাত্তাও দিলেন না। পার্ক সার্কাসের পার্ক ঘুরে গিয়ে ডানধারে একটা রাস্তা ধরলেন। নির্জন রাস্তা।

কোথায় যাচ্ছেন?– লীনা রায় চেঁচিয়ে উঠল।

বয়ফ্রেন্ড।

তার মানে?

বয়ফ্রেন্ড মানে দরকার নেই। কিন্তু বানানটা দরকার। বি ও ওয়াই এফ আর আই ই এন ডি। কটা অক্ষর হল?

মাই গড! আপনি কি সত্যিই পাগল?

ঠিক নটা অক্ষর আছে। কিন্তু আমাদের কম্পিউটারের ঘর আটটা। সুতরাং আপনাকে একটা অক্ষর ড্রপ করতে হবে। ফ্রেন্ড-এর আই অক্ষরটা বাদ দিন। শুধু এফ আর ই এন ডি হলেই চলবে।

তার মানে?

আপনি কি ফাটা রেকর্ড? তার মানে তার মানে করে যাচ্ছেন কেন? একটু চুপ করে সিচুয়েশনটা মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করুন।

লীনা চোখ বুজে কম্পিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর চাপা স্বরে বলল, আই হেট ইউ।

ধন্যবাদ। কিন্তু বানানটা শিখে নিন। বয়ফ্রেন্ড ঠিক যেমনটি বললাম।

লীনা সোজা হয়ে বসে বলল, আমি জানতে চাই, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

ববি রায় তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন, আপনি কম্পিউটার অপারেট করতে পারেন?

জানি না।

নো প্রবলেম। বলে ববি রায় তার হাওয়াই শার্টের বুক-পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লীনার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

ওটা কী?

এটাতে হিন্ট দেওয়া আছে। কম্পিউটার চালু করে প্রথমে কোডটা ফিড করবেন। তারপর ইনফরমেশন ডিমান্ড করবেন।

আমি পারব না।

পারতেই হবে। পারতেই হবে। পারতেই–

মিস্টার রায়, আমি আপনার স্লেভ নই। আপনার আচরণ বর্বরদের মতো। আপনি–

ভেরি ইজি। কম্পিউটার ইন ফ্যাক্ট একটা ট্রেইন্ড বাঁদরেও অপারেট করতে পারে। যদিও আপনার গ্রে-ম্যাটার কম, তবু এ কাজটায় তেমন ব্রেন-ওয়ার্কের দরকারও নেই।

মিস্টার রায়–

ঠিক সাত দিন বাদে কোডটা বদলাতে হবে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। সাত দিনের মাথায়–

মিস্টার রায়, গাড়ি থামান! আমি নেমে যাব।

এবার ববি রায় লীনার দিকে তাকালেন। ভ্রু একটু ওপরে তুলে বললেন, সামনেই ইস্টার্ন বাইপাস। এ জায়গা থেকে ফিরে যাওয়ার কোনও কনভেয়ান্স নেই।

তা হোক। কলকাতায় আমার একা চলাফেরা করে অভ্যাস আছে।

ববি রায় নীরবে গাড়িটা চালাতে লাগলেন। বিশ্রী এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। অত্যন্ত ঘিঞ্জি বস্তি এবং ননাংরা পরিবেশের ভিতর দিয়ে প্রকাণ্ড গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলেছে। কিন্তু ভিতরটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত আর গদি নরম বলে তেমন কষ্ট হচ্ছে না লীনার।

ববি রায় বেশ কিছুক্ষণ বাদে বললেন, আমি একটু বাদেই নামব। আপনি এই গাড়িটা নিয়ে ফিরে যাবেন।

লীনা চমকে উঠে বলল, গাড়ি নিয়ে?

কেন, আপনি তো গাড়ি চালাতে জানেন!

জানি, কিন্তু আমি কেন গাড়ি নিয়ে ফিরব?

এ গাড়িটা আপনার নামে অফিসের লগবুকে আজ থেকে অ্যালট করা হয়েছে।

কিন্তু কেন?

ববি রায় নির্বিকার মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, গাড়িটা পছন্দ নয়?

উঃ, আমি কি পাগল হয়ে যাব?

এটা বেশ ভাল গাড়ি মিসেস ভট্টাচারিয়া, খুব ভাল গাড়ি। তেলের খরচ কোম্পানি দেবে। চিন্তা করবেন না।

লীনার মাথা এতই তালগোল পাকিয়ে গেছে যে, সে এবার ‘মিসেস ভট্টাচারিয়া’ শুনেও আপত্তি করতে পারল না। আসলে সে কথাই বলতে পারল না।

ববি রায় ইস্টার্ন বাইপাসে গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরালেন। চওড়া ফাঁকা মসৃণ রাস্তা। দিনান্তের ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিকের চরাচর। কুয়াশা জমে উঠেছে চারদিকে।

লীনা দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল।

ববি রায় মাথা নাড়লেন, ওভাবে খোলে না। সুইচ আছে মিম ভট্টাচারিয়া। কিন্তু ওসব শিখে নিতে খুব বেশি গ্রে-ম্যাটারের দরকার হবে না। এই যে, এইখানে সুইচ, চারটে দরজার জন্য চারটে সুইচ।

ওঃ, মাই গড।

এত ভগবানকে ডাকছেন কেন বলুন তো! এখনও কিন্তু আপনি তেমন বিপদে পড়েননি।

তার মানে?

ববি রায় এবার হাসলেন। লীনা এই স্বল্প আলোতেও দেখল, এই রোগা খ্যাপাটে কালো লোকটার হাসিটা ভীষণ রকমের ভাল।

ববি রায় হাসিটা মুছে নিয়ে বললেন, তবে বিপদে পড়বেন। হয়তো বেশ মারাত্মক বিপদেই, নিজের কোনও দোষ না-থাকা সত্ত্বেও।

তার মানে?

ওঃ, আপনার আজ একটা কথাতেই পিন আটকে গেছে। তার মানে’ ছাড়া অন্য কোনও ডায়ালগ কি মাথায় আসছে না?

না। আমি এসবের মানে জানতে চাই।

অত কথা বলার যে সময় নেই আমার। আমার সময় বড্ড কম। খুন হয়ে যাওয়ার আগে আমাকে তাড়াতাড়ি আমার সব কিছু গুটিয়ে নিতে হবে।

আপনি কেবল খুন-খুন করছেন কেন?

ববি রায় একটা প্রকাণ্ড শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি রোমান্টিক বাঙালির মতো মৃত্যুচিন্তা করি না মিসেস ভট্টাচারিয়া–

মিসেস নয়, মিস–

ইররেলেভেন্ট। বয়ফ্রেন্ড মনে থাকবে?

না থাকার কী আছে! আর ফর ইয়োর ইনফরমেশন আমি কম্পিউটারের একটা কোর্স করেছিলাম। আমার বায়োডাটায় সে কথ, লেখা ছিল।

তা হলে তো আপনার আই-কিউ বেশ হাই! অ্যাঁ!

লীনা রাগে চিড়বিড় করল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

ববি রায় বললেন, এ গাড়িটা নিয়ে এখন থেকে অফিসে যাবেন। সেফ গাড়ি। কাচগুলো বুলেট-প্রুফ।

বাড়িতে কী বলব?

বলবেন, অফিস থেকে গাড়িটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে। সেটা মিথ্যেও নয়।

আর কী করতে হবে?

ববি রায় হাসলেন, আপনি তো কবিতা লেখেন! আমার ওপর একটা এপিটাফ লিখবেন। কেমন?

৩. ববি রায় যেখানে গাড়িটা থামালেন

ববি রায় যেখানে গাড়িটা থামালেন সে জায়গাটা লীনার চেনা। ডান ধারে ওই দেখা যাচ্ছে যুবভারতী স্টেডিয়াম, ছড়ানো-ছিটানো লোকালয়।

ববি রায় বললেন, রাস্তাঘাট তো আপনি ভালই চেনেন। গাড়ি নিয়ে একা ফিরে যেতে পারবেন তো!

পারব। কিন্তু–

কিন্তু, তবে, তার মানে, এই সব শব্দগুলোকে বর্জন করতে হবে। এ দেশের লোকেদের কোনও কাজই এগোতে চায় না ওই সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব আর ভয়ের দরুন।

লীনা ফুঁসে উঠে বলল, আপনি যে একটা ইচ্ছেমতো মিস্ত্রি তৈরি করছেন না, তা কী করে বুঝব? মিস্ত্রি তৈরি করব? কেন, ববি রায়ের কি এতই বাড়তি সময় আছে?

সেটাই বুঝতে পারছি না।

ববি রায় মাথা নেড়ে বললেন, মিষ্ট্রি হয়তো একটা তৈরি হয়েছে, তবে সেটা আমি তৈরি করিনি।

লীনা গলায় যথেষ্ট রাগ পুষে রেখে বলল, তা হলে শেষ অবধি আমাকে করতে হবে কী? একটা কোডেড ইনফরমেশন কম্পিউটার কি করা তো?

ববি রায় মাথা নাড়লেন, না। ইনফরমেশনটা কিল করতে হবে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবেই।

‘তার মানে’ বলতে গিয়েও লীনা নিজেকে সামলে নিল।

ববি রায় বললেন, আমার মৃত্যু কোথায় কীভাবে হতে পারে তা তো আপনার জানার কথা নয়। আমি হাইডিং—-হাইডিং মানে কী বলুন তো?

আত্মগোপন করা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা সহজ বাংলাও আছে না! গা-ঢাকা না কী যেন!

আছে।

আমি গা-ঢাকা দিচ্ছি। অফিস পুরোপুরি আপনার হাতে। বি কেয়ারফুল।

এইটুকু বলেই ববি রায় সুইচ টিপলেন, ড্রাইভারের দিককার দরজা খুলে গেল, ববি রায় নেমে দাঁড়ালেন। দরজা বন্ধ করার আগে লীনার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে বললেন, এ গাড়ির অটোমেটিক গিয়ার। পুরোপুরি ইলেকট্রনিক। স্মদ ড্রাইভ।

কিন্তু আপনি কথাটা শেষ করেননি।

কোন কথাটা?

ঠিক কখন আমাকে কম্পিউটার ইনফরমেশন কি করতে হবে।

ওঃ ঠিক খবর পেয়ে যাবেন। মৃত্যুকে লুকোনো যায় না। চলি।

লীনা রাগে বিস্ময়ে দেখল, লোকটা দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে চোখের পলকে কোথায় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তা গাড়ির ভেতর থেকে ভাল বুঝতেই পারল না লীনা।

এই বেশ বড়সড় অটোমেটিক অচেনা গাড়িটাই বা কেন জগদ্দলের মতো চাপিয়ে গেল তার ঘাড়ে তাই বা কে বলবে!

এই নির্জন রাস্তায় বসে চিন্তাভাবনা করা এবং সময় কাটানো বিপজ্জনক। লীনা ড্রাইভারের সিটে বসল, গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করতে লাগল। হচ্ছিল না, বুকটা কাঁপছে লীনার।

আচমকাই তাকে আপাদমস্তক শিহরিত করে একটি পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, ও ডারলিং, ইউ ফরগট দা কী।

অভিভূত লীনার কয়েক সেকেন্ড লাগল ব্যাপারটা বুঝতে, কিন্তু কথা-বলা গাড়ির কথা সে শুনেছে, মনে পড়ল।

ড্যাশবোর্ডে প্রায় একটা জেট প্লেনের টার্মিনালের মতো নানারকম আলোর নিশানা। অস্কৃত গোটা কুড়ি ডায়াল। খুঁজে-পেতে চাবিটা বের করল লীনা।

গাড়ি চমৎকার শব্দহীন স্টার্ট নিল। তারপর অতি মসৃণ গতিতে ছুটতে শুরু করল।

মাঝে মাঝে সেই মোলায়েম পুরুষকণ্ঠ বলতে লাগল, ডারলিং ডোন্ট ফরগেট দি গিয়ার, টাইম টু চেঞ্জ... ওঃ সুইট সুইট ডারলিং, ইউ ক্যান হ্যান্ডেল এ কার... নাউ ডোন্ট প্রেস দি ব্রেক সো হার্ড, ইট গিভস মি এ ব্যাড জোল্ট... উড ইউ লাইক সাম মিউজিক লাভ? প্রেস দি ব্লুবাটন...।

এই বকাবাজ কণ্ঠটিকে বন্ধ করার উপায় জানা নেই লীনার, সে দাঁতে সঁাত টিপে যতদূর সম্ভব গতিতে গাড়িটা চালাতে লাগল। এখনও সময় আছে। অ্যাকাডেমিতে গিয়ে দোলনকে ধরা যাবে।

মোলায়েম দাড়ি, মধ্যম দীর্ঘ, ছিপছিপে, প্যান্ট আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরা কাঁধে ঝোলাব্যাগ। অ্যাকাডেমির ফটকের ভিতরে উদাসীন মুখ নিয়ে দোলন দাঁড়িয়ে।

গাড়িটা পার্ক করে দরজা খুলে নামতে যাবে, পুরুষকণ্ঠটি বলে উঠল, লাভ, ইউ হ্যাভ ফরগটন দি কী।

লীনা চাবিটা ড্যাশবোর্ড থেকে খুলে নিল। রিংএ দুটো চাবি, একটা দরজার।

দোলন।

দোলন গোল গোল চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, আরিব্বাস? তুমি এ গাড়ি কোথায় পেলে?

অফিস দিয়েছে।

বেড়ে অফিস তো? ঘ্যাম গাড়ি।

শো শুরু হতে আর বাকি নেই। চলো।

দোলন অনিচ্ছের সঙ্গে গাড়িটা থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল, অফিস তোমাকে গাড়ি দেয়?

দিল তো!

তুমি তো শুনেছি মিস্টার রায়ের অফিস-সেক্রেটারি। সেক্রেটারিরা কি গাড়ি পায় লীনা? তার ওপর ওরকম দুর্দান্ত গাড়ি?

লীনা হেসে বলল, এমনিতে দেয়নি, অনেক ব্যাপার আছে। পরে বলব।

দু’ জনে বাগানের ভিতর দিয়ে হল-এর দিকে হাঁটছিল, হঠাৎ দোলন বলল, তুমি আমার পক্ষে বড্ড বড় লীনা, বড্ড হাই।

তুমি এত কমপ্লেক্সে ভোগো কেন? বলছি তো সব বুঝিয়ে বলব, শুনলে দেখবে, আমি এখনও একজন নিতান্তই ছাপোষা সেক্রেটারি মাত্র।

দোলন জবাব দিল না। নাটক দেখার সময় ও কোনও কথা বলল না। কাটা হয়ে বসে রইল।

নাটক শেষ হলে লীনা বলল, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দোলন প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ওই গাড়ি নিয়ে উত্তর কলকাতায়? মাপ করো লীনা। ঢের বাস আছে, চলে যাব।

উঃ, তুমি যে কী প্রিমিটিভ না! আচ্ছা, অন্তত এসপ্লানেড পর্যন্ত তো চলো।

গাঁইগুই করে দোলন রাজি হল।

কিন্তু গাড়িতে উঠতেই বিপত্তি। চাবিটা সবে ঢুকিয়েছে লীনা, গাড়ি অমনি বলে উঠল, আই সি ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড ডারলিং।

দোলন প্রায় বসা-অবস্থাতেই লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করল, এ কী? কে?

লীনা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, ভয় পেয়ো না। এসব ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস। আমেরিকান বড়লোকদের জন্য জাপান বানায়।

দোলন নির্বাক বিস্ময়ে বসে রইল।

পুরুষকণ্ঠ ভারী অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করল, ইজ ইট এ বয়ফ্রেন্ড ডারলিং? গুড ইভনিং বয়ফ্রেন্ড। হ্যাভ এ নাইস টাইম।

লীনার পরিষ্কার মনে আছে ববি রায় যতক্ষণ গাড়িটা চালাচ্ছিলেন তখন কণ্ঠস্বরটি স্তব্ধ ছিল। ববি নেমে যাওয়ার সময়ে বোধহয় দুষ্টুমিটুকু করে গেছেন।

বয়ফ্রেন্ড কথাটা দু'বার ধাক্কা দিল লীনাকে, বয়ফ্রেন্ড! যদি ববি রায় মারা যায় তা হলে–

লীনা, এ গাড়ি সত্যি তোমাকে অফিস থেকে দিয়েছে?

বললাম তো! বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। তবে তুমি খুব বিগ বিগ ব্যাপারের মধ্যে চলে গেছ বলে মনে হচ্ছে।

না, দোলন। বিগ ব্যাপার নয়। তবে আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। তোমাকে একদিন সব বলব।

কী দরকার লীনা? কথার মাঝখানে হঠাৎ পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, হোয়াট ইজ ইয়োর বার্থ-ডে বয়ফ্রেন্ড?

দোলন হঠাৎ লীনার হাত চেপে ধরে বলল, আমার মনে হচ্ছে গাড়ির পিছনের সিটে কেউ লুকিয়ে আছে। আলোটা জ্বালো তো।

লীনা একটু চমকে উঠল এ কথায়। খুঁজে-পেতে আলোর বোতামটা পেয়েও গেল।

না, পিছনের সিটে কেউ নেই। একদম ফাঁকা।

লীনা লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, এমন ভয় পাইয়ে দাও না মাঝে মাঝে!

তোমার গাড়ি আমার জন্মদিন জিজ্ঞেস করছে কেন?

না হয় করলই, তাতে তোমার পিছনের সিটে কেউ লুকিয়ে আছে বলে মনে হল কেন?

কেন মনে হল? কারণ আমার জন্মদিন আজ। সন্দেহ হচ্ছিল, আমার চেনা কোনও বন্ধুবান্ধবকে তুমি গাড়িতে লুকিয়ে এনেছ যে আড়াল থেকে রসিকতা করে যাচ্ছে।

আজ? হিয়ার ইজ মিউজিক ফর ইউ বয়ফ্রেন্ড।

‘হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ’ বাজতে লাগল লুকনো স্পিকারে। দোলন বাক্যহারা হয়ে গেল।

লীনা কিন্তু ভ্রু কুঁচকে ভাবছিল। দোলনের জন্মদিন কবে যে তা সে নিজেও এতকাল জানত না। সুতরাং এই গাড়ির ইলেকট্রনিক মগজেরও জানবার কথা নয়। তবে কি কোনও সংকেত? বার্থ ডে? ক’টা অক্ষর হচ্ছে? ঠিক আটটা, কম্পিউটারের আটটা ঘর, পরবর্তী কোড।

তোমার বস কেমন লীনা?

কেমন? কেন, ভালই।

মানে কত বয়স-টয়স?

আর ইউ জেলাস?

আরে না, বলোই না!

পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে।

ম্যারেড?

কী করে জানব?

খুব স্মার্ট না?

লীনা হেসে ফেলল, ইউ আর রিয়েলি জেলাস। শোনো তোমাকে একটা কথা বলি। ববি রায় বিশ্ববিখ্যাত লোক। ইলেকট্রনিক উইজার্ড। আমি কেন, পৃথিবীর কোনও মেয়ের দিকেই মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় লোকটার নেই। যদি ম্যারেড হয়ে থাকে তবে ওর স্ত্রীর মতো হতভাগিনী কমই আছে।

বুঝলাম।

লোকটা দেখতে কেমন জানতে চাও? লম্বায় তোমার চেয়ে অন্তত দু'ইঞ্চি কম। কালো, রোগা, ছটফটে। দেখলে মনেই হবে না যে লোকটা জিনিয়াস।

এসপ্লানেড এসে গেল। দোলন কেমন স্বপ্লেখিতের মতো নামল। লীনার দিকে একবার তাকিয়ে হাতখানা একবার তুলে দায়সারা বিদায় জানিয়ে ভিড়ে মিশে গেল।

আগামীকাল লীনার অফিসে যাওয়ার কথা আগে থেকেই হয়ে আছে দোলনের। কাল লীনা মাইনে পাবে। দু'জনের সন্ধের খাবারটা পার্ক স্ট্রিটে খাওয়ার কথা।

নিরাপদেই বাড়ি ফিরে এল লীনা। শুধু সারাক্ষণ ওই পুরুষকণ্ঠের টীকা-টিপ্পনী সয়ে যেতে হল। কাল সকালে চেষ্টা করে দেখবে কীভাবে ওটা বন্ধ করা যায়।

বাড়িতে দুটো গ্যারেজ। গাড়িটা সুতরাং গাড়ি-বারান্দার একধারে রাখতে হল লীনাকে।

যখন ঘরে এল লীনা তখন হঠাৎ রাজ্যের ক্লান্তি এসে শরীরে ভর করল। একটা দিনে কত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে গেল। কোনও মানে হয়? এখনও মনে হচ্ছে বোধহয় স্বপ্ন।

খাওয়ার টেবিলে লীনার সঙ্গে তার বাবার দেখা হতেই কুঞ্চনসহ প্রশ্ন, তুমি কার গাড়ি নিয়ে এসেছ?

অফিসের।

অফিস তোমাকে গাড়ি দিচ্ছে কেন?

একটা জরুরি কাজে কিছু ঘোরাঘুরি করতে হবে, তাই।

তা বলে এত দামি গাড়ি?

লীনা বিরক্তির গলায় বলল, গাড়িটা তো আর দান করেনি, ধার দিয়েছে।

কেন? অ্যাম্বাসাডার ফিয়াট মারুতি, এসবও তো ছিল।

আমি অত জানি না, দিয়েছে ব্যবহার করছি।

বাবা একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার দাদার হয়তো এরকম গাড়ি আছে। তুমি তার কাছ থেকে–

লীনা প্লেট ছেড়ে উঠে বলল, সন্দেহ হলে খোঁজ নিতে পারো, তবে ওটা দাদার গাড়ি নয়।

তোমার বস ববি রায়কে আমি কাল টেলিফোনে জিজ্ঞেস করব।

কোরো।

ঠিক আছে। খেয়ে নাও।

লীনা বৈষ্ণবীর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, খাবারটা আমার ঘরে দিয়ে এসো।

মা অন্যধার থেকে মেয়ের দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, তোমার রাগ করা উচিত নয়। এত বড় একটা আধুনিক গাড়ি অফিস থেকে তোমাকে দেবে কেন?

ইউ আর জেলাস।

লীনা সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে বসেই খেল লীনা। বৈষ্ণবী এঁটোকাঁটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সে তার ব্যাগ খুলে কার্ডটা বের করল। ববি রায়ের দেওয়া। কম্পিউটার ক্রিয়াশীল করার কিছু সংকেত, ববি রায়ের ছাপা ফোন নম্বর ইত্যাদি।

কার্ডটা ওলটাতেই চমকে গেল লীনা, শুধু চমকাল না, তার সারা শরীর রাগে রি রি করে কাঁপতে লাগল। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল মুখ-চোখ। সে অত্যন্ত জ্বালাভরা চোখে চেয়ে ছিল ডটপেনে লেখা একটা লাইনের দিকে, আই লাভ ইউ।

না, এর একটা বিহিত করা দরকার। দাঁতে দাঁত পিষে লীনা গিয়ে লিভিংরুমে টেলিফোনটা এক ঝটকায় তুলে ক্রুদ্ধ আঙুলে ববি রায়ের নম্বর ডায়াল করল।

ওপাশ থেকে একটা নিরাসক্ত গলা বলে উঠল, ববি রায় ইজ নট হোম...ববি রায় ইজ নট হোম।

লীনা তীব্র স্বরে বলল, দেন হোয়ার ইজ হি?

উদাসীন গলা বলেই চলল, ববি রায় ইজ নট হোম... ববি রায় ইজ নট হোম...

আই হেট হিম।

ববি রায় ইজ নট হোম।

লীনা একটু থমকাল। সে যতদূর জানে, এ দেশে এখনও টেলিফোনে রেকর্ডেড মেসেজ-এর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ববি রায়ের বাড়ির টেলিফোনে রেকর্ডেড মেসেজই শোনা যাচ্ছে। অবশ্য ইলেকট্রনিকসের জাদুকরের পক্ষে এসব তো ছেলেখেলা।

লীনা ঘরে ফিরে এল এবং ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোল।

পরদিন সকালে যখন অফিসে বেরোতে যাবে লীনা, তখন দিনের আলোয় গাড়িটা ভাল করে দেখল সে। জাপানি গাড়ি। এর কত লাখ টাকা দাম তা লীনা জানে না। কিন্তু এত দামি গাড়ি তার হাতে এত অনায়াসে ছেড়ে দেওয়াটারও মানে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে লীনা, চাবিটা ঘোরানো মাত্র সেই মোলায়েম পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, গুড মর্নিং ডারলিং, আই লাভ ইউ।

অসহ্য! লীনা পাগলের মতো যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করল, গলাটাকে বন্ধ করার জন্য, পারল না।

তারপর চুপ করে বসে রাগে বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর মাথার মধ্যে যেন খট করে একটা আলো জ্বলে উঠল। তাই তো, আই লাভ ইউ, এটা তো প্রেমের বার্তা নয়। আই লাভ ইউ-তে যে মোট আটটা অক্ষর।

লীনা একাই একটু হাসল। মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল। গাড়ি ছাড়ল সে।

অফিসে এসে নিজের ঘরখানায় বসে একটু কাগজপত্র গুছিয়ে নিল সে। তারপর উঠে ববি রায়ের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

ঢুকেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল সে।

একটা লম্বা চেহারার যুবক শিস দিতে দিতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজছে, খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গি।

লীনা হঠাৎ ধমকে উঠল, হু আর ইউ?

যুবকটিও ভীষণ চমকে উঠল। শুধু চমকালই না, সটান দুটো হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল, যেন কেউ তার দিকে পিস্তল তাক করেছে। তারপর হাত দুটো নামিয়ে বলল, ও, আপনার তো পিস্তল নেই দেখছি।

৪. বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন লীনা

বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন লীনা রাগের গলায় বলল, না, আমার পিস্তল নেই। কিন্তু আপনি কে? এ ঘরে

আপনার কী দরকার?

ছেলেটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, পিস্তল আমারও নেই। কিন্তু আমার যা কাজ তাতে একটা পিস্তল থাকলে ভাল হত। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

লীনা অবাক হয়ে ছেলেটাকে ভাল করে দেখল। বয়স পঁচিশের মধ্যেই। ছিপছিপে খেলোয়াড়োচিত মেদহীন চেহারা। তবে বুদ্ধির বিশেষ ছাপ নেই মুখে। মুখশ্রী বেশ ভাল। পরনে জিনস আর একটা সাদা কুর্তা।

লীনা টেবিল থেকে ইন্টারকম টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, আপনি যে-ই হোন, ট্রেসপাসার। আমি অফিস সিকিউরিটিকে ফোন করছি। যা বলার তাদের কাছে বলবেন।

প্লিজ! কথাটা শুনুন।

কী কথা?

আমি ট্রেসপাসার ঠিকই, কিন্তু আমার কোনও খারাপ মতলব ছিল না।

লীনা ভ্রু কুঁচকে বলল, আপনি অফিসের টপ সিকিউরিটি জোনে ঢুকেছেন। আপনি এ ঘরে ঢুকে সার্চ করছিলেন। আপনাকে পুলিশে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

ছেলেটা একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে কাহিল গলায় বলল, কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর কাজ করতেই যে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল!

লীনা ভ্রু কুঁচকেই ছিল। গম্ভীর গলায় বলল, কী কাজ?

বলাটা কি ঠিক হবে?

তা হলে সিকিউরিটিকে ডাকতেই হয়।

বলছি বলছি। কিন্তু প্লিজ, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

লীনা ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, যা বলার সংক্ষেপে বলুন।

ছেলেটা রীতিমতো ঘামছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে বলল, আমি একজন লাইসেন্সড প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

শুনেছি। তারপর?

আমার অফিসটা ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায়।

লীনা একটা প্যাড টেনে চট করে নোট করে নিতে লাগল।

প্রায় এক বছর হল অফিস খুলে বসে আছি। মক্কেল জোটে না। বেকার মানুষ, কী আর করব! তবে বুঝতে পারছিলাম এ দেশে ডিটেকটিভদের ভাত নেই। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ডিটেকটিভ হওয়ার বড় শখ ছিল। গাদা গাদা গোয়েন্দা গল্প পড়ে পড়ে–

আপনার জীবনটা সংক্ষেপ করে কাজের কথায় আসুন।

আসছি। বলছিলাম যে, অনেকদিন কাজকর্ম কিছু জোটেনি। হঠাৎ কাল সকালে অফিসে এসে একখানা খাম পেলাম। ভিতরে পাঁচটা একশো টাকার নোট। আমার নিজস্ব কোনও বেয়ারা বা অফিস বয় নেই। একজন ভাগের বেয়ারা জল-চা এনে দেয়। কে যে খামটা কখন রেখে গেছে তা সে বলতে পারল না।

খামের ওপর আপনার নাম লেখা ছিল?

ছিল। টাইপ করা।

তারপর?

কাল বিকেলের দিকে একটা ফোন এল। আমার নিজস্ব ফোনও নেই। পাশে একটা সাপ্লায়ারের অফিস আছে, তাদের ফোন। ফোন ধরতেই একটা গম্ভীর গলা বলে উঠল, টাকাটা পেয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু কিসের টাকা? লোকটা বলল, আরও টাকা রোজগার করতে চান? বললাম, চাই। লোকটা তখন বলল, তা হলে একটা ঠিকানা দিচ্ছি। সেখানে কাল সকাল ন'টার মধ্যে চলে যাবেন। ববি রাষ নামে একজনকে খুব নিখুঁতভাবে খুন করতে হবে।

লীনার হাত থেকে ডটপেনটা খসে পড়ে গেল।

ছেলেটা আবার রুমালে কপাল মুছল। একটু কাঁপা গলায় বলল, ম্যাডাম, সবটা আগে শুনুন।

লীনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বলুন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, এ কাজ আমি পারব না। লোকটা বলল, পারতে হবে। নইলে বিপদে পড়বেন। কাজটা খুব সোজা। ন'টা থেকে দশটা অবধি ববি রায় একা থাকে। তার সেক্রেটারি আসে দশটায়। ঘরে ঢোকবার সময় দরজায় নক করবেন না। সোজা ঢুকে পড়বেন। তখন ববি রায় নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে কোনও কাজ করবে। আপনাকে লক্ষও করবে না। ববি রায়, বাস্তব জগতে কমই থাকে। একখানা ভাল ড্যাগার নিয়ে যাবেন, দুদিকে ধারওয়ালা। পেটে বা বুকে পুশ করবেন। বডিটা ডেস্কের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবেন। হাতে অবশ্যই দস্তানা পরে নেবেন।

আপনি রাজি হলেন?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, না। রাজি হচ্ছিলাম না। কিন্তু লোকটা বলল, কাজটা আপনি করবেন বলে ধরে নিয়ে আমরা অলরেডি পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। টেবিলে ফিরে গিয়ে আপনি টাকাটা পেয়ে যাবেন। বলেই ফোনটা কেটে দিল।

পেয়েছিলেন?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, পেয়েছিলাম। সাদা খামে কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকা। বেয়ারা এবারও বলতে পারেনি খামটা কে রেখে গেল। বলা সম্ভবও নয়। ও বাড়িতে পায়রার খোপের মতো রাশি রাশি অফিস, হাজার লোকের আনাগোনা।

টাকাটা পেয়ে আপনি কী ঠিক করলেন?

কী ঠিক করব? আমি জীবনে কখনও খুনখারাপি করিনি। মিস্টার রায়কে খুন করার জন্য আমাকে কেন লাগানো হল আমি তাও বুঝতে পারছি না। তবে আমার কৌতূহল হয়েছিল। খুব কৌতূহল। আমি ঠিক করলাম, আজ এসে ববি রায়ের সঙ্গে দেখা করে যাব। লোকটা কে বা কী, কেন ওকে খুন করার জন্য এত টাকা কেউ খরচ করতে চাইছে তা জানার জন্যই আজ আমি এসেছিলাম। এসে শুনলাম উনি নেই। তাই–

তাই তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লেন?

ছেলেটা একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, ওই একটা কাজ আমি খুব ভাল পারি। মশামাছির মতো যে-কোনও জায়গায় ঢুকে যেতে পারি। কেউ আমাকে আটকাতে পারে না।

বুঝলাম। কিন্তু এ ঘরে আপনি কী খুঁজছিলেন?

ওটা আমার একটা মুদ্রাদোষ। যেখানেই যাই সেখানেই কাগজপত্র নথি খুঁজে দেখা আমার স্বভাব। কী যে খুঁজছি তা ভাল করে জানিও না।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, আপনার কথা আমি একটুও বিশ্বাস করছি না।

অবিশ্বাস্যই বটে। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই আমার কার্ড দেখুন। খোঁজখবর নিন। আমি জেনুইন ইন্দ্রজিৎ সেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

আপনি অপেক্ষা করুন। সিকিউরিটি এসে আপনাকে সার্চ করবে।

সার্চ! সে তো আপনিই করতে পারেন। এই দেখুন না! বলে ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পকেটের সামান্য কয়েকটা জিনিস বের করে টেবিলে রাখল। মানিব্যাগ, চাবি, রুমাল, নামের কার্ড, ডটপেন, আতস কাচ আর অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের একটা স্ট্রিপ।

এ ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই। আপনি দেখতে পারেন খুঁজে।

পুরুষমানুষের বডি সার্চ করা মেয়েদের পক্ষে শোভন নয়।

তা অবশ্য ঠিক। তবে আমাকে বিশ্বাস করলে ঠকবেন না।

লীনা বিশ্বাস করল না। ইন্দ্রজিতের কার্ডে ছাপা ফোন নম্বরে ডায়াল করল।

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স।

লীনা শুনতে পেল একটা বেশ ভিড়াক্রান্ত অফিসের গণ্ডগোল ভেসে আসছে ফোনে। সে একটু উঁচু গলাতেই জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মিস্টার ইন্দ্রজিৎ সেনকে একটু ডেকে দিতে পারেন?

ধরুন, দেখছি।

লীনা ফোন ধরে রইল।

একটু বাদেই গলাটা বলল, না এখনও আসেনি। কিছু বলতে হবে?

না, ধন্যবাদ। আপনাদের অফিসটা কত নম্বর ধর্মতলায়?

ত্রিশ নম্বর।

ধন্যবাদ।

লীনা ফোনটা রেখে দিল।

ইন্দ্রজিৎ তার দিকে চোরের মতো চেয়ে ছিল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, বিশ্বাস করলেন?

না। ওই ফোন নম্বরে হয়তো আপনার লোকই বসে আছে। অথবা ইন্দ্রজিৎ সেনের নাম ভাঁড়িয়ে আপনি অন্য কেউ হতে পারেন।

ছেলেটা বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। হয়ও।

লীনা মৃদু একটু হেসে বলল, তা হলে আমার এখন কী করা উচিত?

উচিত পুলিশে দেওয়া। কিন্তু আমি তো কিছুই লুকোইনি। ইচ্ছে করলে আপনি আমার সঙ্গে এখন আমার অফিসে গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। সেখানে অন্তত একশোলোক আমাকে জেনুইন ইন্দ্রজিৎ সেন বলে আইডেনটিফাই করতে পারবে।

নিতান্তই ছা-পোষা চেহারার এই লোকটাকে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে ইচ্ছে হল না লীনার। তবে সে একে একেবারে ছেড়েও দেবে না। লীনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে। আমি পরে খোঁজ নেব। আপনি আসুন।

লোকটা দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই লীনা সিকিউরিটিকে ফোন করল, ববি রায়ের সেক্রেটারি বলছি। জিনস আর সাদা কামিজ পরা একজন বছর পঁচিশের লোক এইমাত্র বেরিয়ে গেল। তাকে আটকান। সার্চ হিম, ক্রস একজামিন হিম প্রপারলি। আইডেনটিফাই করুন। ভেরি আর্জেন্ট।

লীনা উঠে দরজাটা লক করল। তারপর সুইচ টিপে ভিডিয়ো ইউনিটটা বের করে আনল গুপ্ত চেম্বার থেকে। তারপর কোড দিল, বয়ফ্রেন্ড।

পরদায় ফুটে উঠল, নো অ্যাকসেস। ট্রাই সেকেন্ড কোড।

লীনা চাবি টিপল, বার্থ ডে।

পরদায় ফুটল, নো অ্যাকসেস। ট্রাই থার্ড কোড।

লীনা আবার কোড দিল, আই লাভ ইউ।

পরদায় ফুটে উঠল, কনগ্রাচুলেশনস, ইউ হ্যাভ ডান ইট।

এর মানে কী কিছুই বুঝতে পারল না লীনা। দাঁতে দাঁত চেপে রাগে সে ফুঁসতে লাগল। ববি রায় কোনও প্র্যাকটিক্যাল জোক করে গেছেন কি?

নো অ্যাকসেস! লীনা টপ করে লেখাটা মুছে চাবি টিপল, নো অ্যাকসেস।

পরদায় ফুটে উঠল, দ্যাটস ক্লেভার অফ ইউ মিসেস ভট্টাচারিয়া!

লীনা দু'হাতে কপাল চেপে ধরে বলল, ও গড। লোকটা কী ভীষণ পাজি।

স্কাউন্ড্রেল! স্কাউন্ড্রেল!

ভিডিয়ো ইউনিটটা আবার যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে লীনা ববি রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের চেম্বারে বসল। ভাবতে লাগল। মাথাটা গরম। কান ঝাঁ ঝা করছে।

ফোনটা বাজতেই তুলে নিল লীনা, হ্যালো।

সিকিউরিটি বলছি। লোকটার নাম ইন্দ্রজিৎ সেন। সার্চ করে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। বাড়ি পাইকপাড়ায়, অফিস ধর্মতলায়। লোকটার বিরুদ্ধে কোনও স্পেসিফিক চার্জ থাকলে বলুন, পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দেব।

নেই। ওকে ছেড়ে দিন।

লীনা কিছুক্ষণ ভূতগ্রস্তের মতো বসে রইল। তারপর উঠে আবার ববি রায়ের ঘরে ঢুকল। দরজা লক করে ভিডিয়ো ইউনিট নিয়ে বসে গেল। বয়ফ্রেন্ড। বার্থ ডে। আই লাভ ইউ। নো অ্যাকসেস।

পরপর একই উত্তর দিয়ে গেল যন্ত্র।

শেষ উত্তরটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল লীনা, দ্যাটস ক্লেভার অফ ইউ মিসেস ভট্টাচারিয়া।

একটু বিদ্রুপ আর তাচ্ছিল্য মেশানো মন্তব্যটা বিছের হুলের মতো বিধে রইল লীনার মনের মধ্যে। হামবাগ, ইনসোলেন্ট, মেগালোম্যানিয়াক।

বেশ কিছু চিঠিপত্র টাইপ এবং কয়েকটা মেসেজ পাঠানোর ছিল লীনার। বসে বসে চুপচাপ কাজ করে গেল। টিফিন খেল। এরই ফাঁকে একবার অ্যাকাউন্টসে ফোন করল। যে-কোনও অফিসারের গতিবিধি অ্যাকাউন্টসই দিতে পারে। ওদের কাছে সকলের টিকি বাঁধা।

মিস্টার রায় কি কলকাতায় নেই? উনি আমার জন্য কোনও মেসেজ রেখে যাননি।

হ্যাঁ, উনি আজ ভোরের ফ্লাইটে বম্বে গেছেন। তারপর ইউরোপে যাচ্ছেন আজ রাতে।

ইউরোপে কোথায়?

প্রথমে প্যারিস, তারপর আরও অনেক জায়গায়।

ধন্যবাদ।

লীনা আরও কিছুক্ষণ কাজ করল। এক ফাঁকে ক্যাশ-কাউন্টার থেকে বেতন নিয়ে এল।

পাঁচটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট তখন রিসেপশন থেকে ফোন এল, দোলন এসেছে। অপেক্ষা করছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লীনা। ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

বেরোতে যাবে, ঠিক সেই সময়ে মারাত্মক ফোনটা এল।

হ্যাল্লো।

হ্যালো, আমি মিস লীনা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমিই লীনা। বলুন।

আপনি ইন্দ্রজিৎ সেনকে চেনেন?

কে ইন্দ্রজিৎ?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিৎ সেন?

ওঃ হ্যাঁ। স্মল টাইম প্রাইভেট আই। কী ব্যাপার?

ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি ওর পাশের অফিসে কাজ করি। ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স। আমি ওর বন্ধু। আজ দুপুরে অফিসে এসে ও আমাকে বলল, ওর যদি কিছু হয় তা হলে যেন আপনাকে একটা খবর দিই।

লীনা একটু শিহরিত হল, কী হয়েছে?

ইন্দ্র মারা গেছে।

হ্যাঁ।

দুপুরে কেউ এসে স্ট্যাব করে গেছে। দরজার তলা দিয়ে করিডোরে রক্ত গড়িয়ে আসায় আমরা টের পাই।

লীনার হাত কাঁপছিল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কোনওক্রমে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই বেঁচে নেই?

না। অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। পুলিশ এসে একটু আগে ডেডবডি নিয়ে গেল। আপনি কি ওর কেউ হন?

না।

গলাটা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, আপনার সঙ্গে কোনও ইন্টিমেসি ছিল না?

মোটেও না। আজ সকালে মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ।

ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। এগারোটা নাগাদ অফিসে এসে ও আমাকে করিডোরে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বলে, আমার একটা বিপদ ঘটতে পারে। শোনো, যদি আমার কিছু হয় তা হলে এই চিরকুটে যার নাম আর ফোন নম্বর দেওয়া আছে তাকে একটা খবর দিয়ো। বোলো, উনি যেন আমার অফিসে একবার আসেন। কিন্তু কেন? আমি তো ওকে ভাল করে চিনতামও না।

জানি না, ম্যাডাম। তবে ও এমনভাবে কথাটা বলেছিল যাতে মনে হয়, আপনি ওর খুব কাছের কেউ। যাকগে, আপনি কি আসতে পারবেন?

লীনা অতি দ্রুত ভাবতে লাগল। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারল না।

লোকটা নিজেই আবার বলল, শুনুন ম্যাডাম। আমি অফিসে সাড়ে ছ' টা অবধি থাকব। সাড়ে পাঁচটার পর অফিসে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। ইন্দ্রজিতের ঘর পুলিশ সিল করে দিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের অফিসের রেকর্ড-রুমের ভিতর দিয়ে ওর ঘরে যাওয়ার একটা ছোট ফোকর রয়েছে। পুলিশ ওটা দেখতে পায়নি।

কিন্তু আমি গিয়ে কী হবে তা তো বুঝতে পারছি না।

সে আপনি ঠিক করবেন। ইন্দ্রজিৎ আমার খুব বন্ধু ছিল। ওর শেষ অনুরোধ রাখতে আমি এই রিস্কটুকু নিতে পারি। যদি আপনি চান তা হলে ওর ঘরে ঢুকবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না।

ঠিক আছে। তবে জানিয়ে রাখলাম, আমি সাড়ে ছ'টা অবধি অফিসে থাকব। আমার নাম দুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

লীনা ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে রইল। এসব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? সত্যিই মারা গেছে লোকটা? খুন!

লীনা টান হয়ে বসে কিছুক্ষণ নীরবে ব্রিদিং করল। তারপর উঠে পড়ল।

রিসেপশনে দোলন চোর-চোর মুখ করে বসে আছে। এই অফিসের ফান্ডা একটু বেশি। দোলন যখনই আসে তখনই অস্বস্তি বোধ করে। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে সবসময়েই কাতর হয়ে থাকে। দোলন। ওই গহ্বর থেকে ওকে আজও টেনে বের করতে পারেনি লীনা।

দু'জনে নীরবে বেরিয়ে এল। বাইরে রোদ মরে আসছে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে একটু।

দোলন।

উঁ!

একটা জায়গায় যাবে?

কোথায়?

ধর্মতলা স্ট্রিটের একটা অফিসে।

ধর্মতলায় আবার তোমার কী কাজ?

লীনা মাথা নেড়ে বলল, কী যে কাজ তা জানি না। কিন্তু চলোই না। তুমি থাকলে ভাল হবে।

আজ আমাদের কী প্রোগ্রাম ছিল, লীনা?

গঙ্গার ধারে বেড়ানো, পার্ক স্ট্রিটে ডিনার।

সেগুলো কি বাতিল করছ?

আরে না, বাতিল করব কেন? ধর্মতলায় আমার কয়েক মিনিটের কাজ। তুমি গাড়িতে বসে থেকো। আমি চট করে ঘুরে আসব।

তোমার ওই ভুতুড়ে গাড়িতে একা বসে থাকব! ও বাবা!

চাবি খুলে নিলে গাড়ি কোনও কথা বলবে না। ভয় নেই।

ত্রিশ নম্বর ধর্মতলা খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধে হল না লীনার। বাড়িটা পুরনো। ভারী ঘিঞ্জি। সরু সিঁড়ি উঠে গেছে ঊর্ধ্বপানে।

তিনতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে লীনা ঘড়ি দেখল। পৌনে ছটা। বেশির ভাগ অফিসই বন্ধ। করিডোর নির্জন। শুধু শেষ প্রান্তে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে সাইনবোর্ড। ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স। তার আগে আর-একখানা ঘর। তার বাইরে টুলের ওপর একজন পুলিশ বসে আছে। পুলিশ দেখে একটু সাহস হল লীনার।

লীনা দরজায় দাঁড়াতেই একটা লোক চমকে মুখ তুলে তাকাল। বয়স বেশি নয়। ইন্দ্রজিতের মতোই। স্বাস্থ্যহীন, রুগ্ন চেহারা। মুখখানায় গভীর বিষাদ।

আপনিই কি মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ।

আসুন।–লোকটা উঠে দাঁড়াল।

লীনা ঘরে ঢুকে চারদিকটা দেখল। চেয়ার-টেবিলে ছয়লাপ। অনেক স্টিলের আলমারি। অফিস-টফিস যেমন হয় আর কী!

লোকটা একটু ভীত গলায় বলল, ধরা পড়লে আমার জেল হয়ে যাবে, তবু ইন্দ্রর কথাটা ফেলতে পারছি না। আসুন, রেকর্ড-রুম ওই পিছন দিকে।

লীনার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। না জেনেশুনে সে বোকার মতো কোনও ফাঁদে পা দিচ্ছে তো!

লোকটা অফিসের চেয়ার টেবিল আলমারি ক্যাবিনেট ইত্যাদির ফাঁক দিয়ে গোলক ধাঁধার মতো পথে লীনাকে একদম পিছন দিকে আর-একটা ঘরে এনে হাজির করল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বলল, এই ঘর।

লীনা অবাক হয়ে দেখল, একটা বদ্ধ কুঠুরি। মেঝে থেকে সিলিং অবধি শুধু স্টিলের তাক। আর তাতে রাশি-রাশি ফাইলপত্র।

আসুন। বলে লোকটা দুটো তাকের মাঝখানে সরু ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর খুব সাবধানে কাঠের পার্টিশান থেকে একখানা পাটা সরিয়ে আনল।

এই দরজা। যাবেন ভিতরে? ভয় করছে না তো! আমার কিন্তু করছে।

লীনা অবিশ্বাসের চোখে ফাঁকটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ডেডবডি তো ভিতরে নেই।

না। তবে রক্ত আছে। মেঝেময়।

ও বাবা!

মিস ভট্টাচার্য, আমি বলি কি আপনি তবু একবার ভিতরটা ঘুরে আসুন। মনে হয় আপনাকে খুব জরুরি কিছু জানানোর ছিল ওর।

লীনা চোখ বুজে কিছুক্ষণ দম ধরে রইল। তারপর ফাঁকটা দিয়ে ইন্দ্রজিতের অফিসে ঢুকল। ছোট্ট একখানা ঘর। ছয় বাই আট হতে পারে। লীনাদের বাথরুমও এর চেয়ে ঢের বড়। ঘরে একখানা ডেস্ক আর একটা স্টিলের আলমারি।

পিছন থেকে দুর্গাচরণ ফিসফিস করে বলল, সাবধানে পা ফেলবেন।

লীনা সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরে একটা গা-গুলোনো গন্ধ।

প্লিজ, কোনও শব্দ করবেন না। ডেস্কের নীচের ড্রয়ারে একটা লেজার বই আছে। ওর যা কিছু ইনফরমেশন ওটাতেই থাকত।

লীনা নিঃশব্দে ডেস্কের নীচের ড্রয়ারটা খুলল। লেজার বইটা বের করে আনল। দুর্গাচরণের রেকর্ড-রুমে ফিরে এসে পাতা ওলটাতে লাগল।

দুর্গাচরণ পাশেই দাঁড়িয়ে। তার শ্বাস কাঁপছে, হাত কাঁপছে।

লেজার বইটা একরকম ফাঁকা। প্রথম পাতাতেই একটা এন্ট্রি। জনৈক বি রায়ের কাছ থেকে পারিশ্রমিক বাবদ পাঁচশো টাকা পাওয়া গেছে। পর পর বি রায়ের নামে আরও কয়েকটা এন্ট্রি।

দুর্গাচরণ বলল, বি রায় ছিলেন, বলতে গেলে, ইন্দ্রজিতের একমাত্র মক্কেল।

বি রায় কে?

দুর্গাচরণ মাথা নেড়ে বলল, চিনি না! কখনও দেখিনি। তবে পুরো নাম ববি রায়।

ববি রায়!–লীনা অবাক গলায় প্রতিধ্বনি করল।

দুর্গাচরণ মাথা নেড়ে বলল, সম্ভবত লীনা ভট্টাচার্য নামে কোনও এক মহিলার পেছনে গোয়েন্দাগিরির জন্য ববি রায় ওকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

মাই গড!

বোধহয় আপনিই!লীনা জবাব দিতে পারল না।

৫. দুর্গাচরণ হাত বাড়িয়ে

দুর্গাচরণ হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিয়ে বলল, মনে হয় এই ইনফরমেশনটুকু আপনাকে জানানোর জনাই ইন্দ্র আপনাকে একবার এখানে আসতে বলেছিল।

লীনা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, কিন্তু আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগানোর মানে কী?

তা তো জানি না। তবে ইন্দ্র প্রায়ই বল, ববির অতি বিপজ্জনক লোক। তার সঙ্গে খুব সমঝে চলতে হয়।

বিপজ্জনক? কতখানি বিপজ্জনক?

দুর্গাচরণ খাতটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, এর ওপর আমাদের হাতের ছাপ থেকে যাওয়াটা উচিত হবে না। দাঁড়ান, আমি এটা জায়গামতো রেখে হাসি।

ফোকর দিয়ে দুর্গাচরণ ইন্দ্রজিতের ঘরে ঢুকে গেল। লীনা টের পেল, তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, রাগে-উত্তেজনা। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে তত ইনফরমেশন তা হলে এভাবেই সংগ্রহ করেছিল বলি রায়। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

দুর্গাচরণ ফিরে এসে তক্তা দিয়ে ফাঁকটা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, মিস ভট্টাচার্য।

কে বলুন তো?

আমার সন্দেহ হচ্ছে ইন্দর মৃত্যুর সঙ্গে ববি রায়ের একটা যোগ আছে। ইন্দ্রজিতের তো বরি ৰায় ছাড়া কোনও মক্কেল ছিল না।

কিন্তু উনি তে বললো. বণি রায়কে, করার জন্য ওঁকে পাঠানো হয়েছিল।

দুর্গাচরণ মৃদু একটু হেসে বলল, হতেও পারে, না-ও হতে পারে! ডিটেকটিভরা সত্যি কথা কমই বলে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে হাঁটছিল। বাইরের অফিস-ঘরটায় এসে লীনা করিডোরটার দিকে সভয়ে তাকাল। পুলিশ এসে বসে ঢুলছে।

আমি যাচ্ছি।

আসুন, দরকার হলে যোগাযোগ করবেন।

লীনা করিডোর পার হয়ে লম্বা সিড়ি ধীর পায়ে ভেঙে নেমে এল।

অত্যন্ত বিবর্ণ মুখে দোলন গাড়িতে বসে আছে।

কী হয়েছে লীনা? তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?

লীনা স্টিয়ারিং-এ বসে দুহাতে মুখ ঢাকল। অবরুদ্ধ কান্নাটাকে কিছুতেই আর আটকাতে পারল না।

কাঁদছ কেন? কী হয়েছে।

লীনা জবাব দিল না।

দোলনের একবার ইচ্ছে হল ওর পিঠে হাত রাখে। হাতটা তুলেও আবার সংবরণ করে নিল। মনে হল, কাজটা ঠিক হবে না।

লীনা, কী হয়েছে বলবে না?

প্রাণপণে কান্না গিলতে গিলতে লীনা বলল, তোমাকে একদিন সবই বলব, দোলন। তবে আজ নয়।

কেউ তোমাকে অপমান করেনি তো, লীনা?

লীনা চোখ দুটো রুমালে মুছে নিয়ে বলল, করেছে, ভীষণ অপমান করেছে। কিন্তু আই শ্যাল টিচ হিম এ গুড লেসন।

দোলন একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি যখন ভিতরে গিয়েছিলে তখন এখানেও একটা ঘটনা ঘটেছে।

কী ঘটেছে?

আমি চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছিলাম হঠাৎ কাচের শার্শিতে একটা লোক টোকা দিল। আমি সুইচ টিপে দরজাটা একটু যাক করতে লোকটা বলল, ওইখানে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে একটু ডেকে দিতে বললেন।

সর্বনাশ! তুমি কী করলে?

আমি ভাবলাম নির্ঘাত তুমিই ডাকছ। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এগিয়ে গেলাম। দরজাটা বন্ধ করে যাইনি, কারণ খুলতে তো জানি না।

তারপর কী হল?

এদিক-ওদিক খুঁজে তোমাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখলাম, লোকটা খোলা দরজা দিয়ে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে কী করছে। আমি ছুটে আসতে না আসতেই লোকটা পট করে পালিয়ে গেল।

কোথায় পালাল?

ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেল!

কীরকম চেহারা? বলা মুশকিল। মাঝারি হাইট, মাঝারি স্বাস্থ্য। মু

খটা ফেল দেখলে চিনতে পারবে?

একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। ভাল করে লক্ষ করিনি।

উঃ, দোলন! তুমি যে কী ভীষণ ভুলো মনের মানুষ!

দোলন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, কিন্তু চুবি করার মতো তো গাড়িতে কিছু ছিল না।

লীনা গাড়ি স্টার্ট দিল। ভিড়াক্রান্ত ধর্মতলা স্ট্রিট এড়িয়ে সূরেন ব্যানার্জি রোড হয়ে ময়দানের ভিতরে নিয়ে এল গাড়ি।

হঠাৎ গাড়ির লুকোনো স্পিকার থেকে পুরুষের সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠল, মিরর, মিরর, হোয়াট ডু ইউ সি?

লীনা চমকে উঠল, তারপর রিয়ারভিউ আয়নার দিকে তাকাল, কিছুই দেখতে পেল না তেমন। রাজ্যের গাড়ি তাড়া করে আসছে।

পুরুষকণ্ঠ উদাস গলায় একটা বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার একখানা ভাঙা লাইন আবৃত্তি করল, দি মিরর ক্র্যাকড ফ্রম সাইড টু সাইড, দি কার্স ইজ আপন মি ক্রাইড দি লেডি অফ শ্যালট...

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, অসহ্য।

তোমার গাড়ি একটু পাগল আছে, লীনা।

পাগল নয়, শয়তান।

পুরুষকণ্ঠ: কান্ট ইউ ড্রাইভ এ বিট ফাস্টার ডারলিং? ফাস্টার?... টেক ইট লাভ...

মিরর! ড্রাইভ ফাস্টার! এর অর্থ কী? লীনা রিয়ারভিউতে একবার চকিতে দেখে নিল। একখানা মারুতি, দুটো অ্যাম্বাসাডার খুব কাছাকাছি তার পিছনে রয়েছে। তার বাইরে

আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি? করলেই বা তা গাড়ির ইলেকট্রনিক মগজ কী করে জানতে পারবে?

লীনার মাথা আবার গুলিয়ে গেল। একটা ট্র্যাফিক সিগন্যালে থেমে আবার যখন গাড়ি চালাল সে তখন স্পিড বাড়িয়ে দিল।

দ্যাটস ও কে ডারলিং! ইউ রান সুইট!... ওঃ ইউ আর ড্রাইভিং রিয়াল ফাস্ট ডারলিং! কিপ ইট আপ...

গঙ্গার ধার বরাবর একটু নির্জন জায়গা দেখে গাড়িটা দাড় করাল লীনা। তারপর দোলনের দিকে তাকাল।

দোলন তার দিকেই চেয়ে ছিল। বলল, কী ব্যাপার বলো তো!

লীনা মাথা নাড়ল, কিছু বুঝতে পারছি না।

দোলন চিন্তিত মুখে বলল, একটা কালো মারুতি কিন্তু সেই থেকে আমাদের পিছু নিয়ে এসেছে।

ঠিক দেখেছ?

ঠিকই দেখেছি। কিন্তু এখানে এসে আর সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না।

লীনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তবু বুঝতে পারছি না। যদি কেউ ফলো করেই থাকে তা হলে গাড়িটা তা বুঝতে পারবে কী করে?

জানি না। এখন চলো, খোলা হাওয়ায় একটু বসি। তোমার খুব বেশি টেনশন যাচ্ছে।

সকালবেলা যখন সিকিউরিটি ব্যারিয়ার পার হচ্ছিলেন ববি রায় তখন সিকিউরিটি চেক নামক প্রহসনটি তার কাছে সময়ের এক নির্বোধ অপচয় বলে মনে হচ্ছিল। বেশ কিছুদিন আগে লন্ডন থেকে রোম যাওয়ার পথে যখন তাঁদের প্লেনটি আকাশপথে ছিনতাই করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয় তখনও ববি রায় দেখেছিলেন, সিকিউরিটি চেক ব্যাপারটার কত ফাঁক-ফোকর থাকে।

হিথরোর শক্ত বেড়া পার হয়ে চার ইহুদি যুবক সশস্ত্র উঠেছিল প্লেনে। খুব বিনীতভাবেই তারা হাইজ্যাক করেছিল বিমানটি, কোনও বাচালতা নয়, চারজন চার জায়গায় উঠে দাঁড়াল, হাতে উজি সাব-মেশিনগান। কাউকে ভয় দেখাযনি, চেঁচামেচি করেনি, গম্ভীর মুখে শুধু কোন পথে যেতে হবে তা বিমানসেবিকা মারফত জানিয়ে দিয়েছিল পাইলটকে।

নির্দিষ্ট জায়গায় প্লেন নামল। চার ইহুদি যুবক কোনও অন্যায় দাবি দাওয়া করল না। শুধু একজন যাত্রীকে প্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে প্লেনটিকে মুক্তি দিয়ে দিল। সেই যাত্রী ছিলেন ববি রায়।

সেই থেকে প্লেনে ওঠার সময় প্রতিবার সিকিউরিটি চেক-এর সময় তাঁর হাসি পায়।

আজ যখন সিকিউরিটির অফিসার তার অ্যাটাচি কেসটা খুলে দেখেটেখে ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন ববি রায় তাকে খুব সহৃদয়ভাবে বললেন, ওর লুকোনো একটা চেম্বার আছে, সেটা দেখলেন না?

অফিসার হাঁ, লুকনো চেম্বার?

ববি রায় অ্যাটাচি কেসটা নিজের কাছে টেনে এনে হাতলের কাছ বরাবর একটা বোতামে চাপ দিয়ে তলাটা আলগা করে দেখালেন।

অফিসার আমতা-আমতা করে বলল, কী আছে এতে?

ববি রায় একটা চকোলেট বার করে দেখালেন, নিতান্তই একটা চকোলেট বার, তবে ইচ্ছে করলে ডিজম্যান্টল করা সাব-মেশিনগান বা লিভলবার বা গ্রেনেড অনায়াসে নেওয়া যায়। হয়তো কেউ নিয়েছে, হয়তো রোজই নেয়।

অফিসার খুবই বিপন্ন মুখে চেয়ে থেকে বলল, অ্যাঁ মানে– আচ্ছা, আমরা এর পর থেকে আরও সাবধান হন।

বিরক্ত ববি বা অ্যাটাচিটা ছেড়ে দিলেন। শরীর যখন সার্চ করা হল তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্তি সঙ্গে লক্ষ করলেন, এরা তার জুতোজোড়া লক্ষই করল না।

ভালই হল। জুতোর নকন হিল-এর মধ্যে রয়েছে পৌনে চার ইঞ্চি মাপের একটা লিলিপুট পিস্তল। দুটো অতিরিক্ত গুলির ম্যাগাজিন।

লাউঞ্জে বসে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ববি রায় যাত্রীদের লক্ষ করতে লাগলেন। তাকে যে আগাগোড়া অনুসরণ করা এবং নজরে রাখা হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ববি রায়ের। যারা তাঁকে নজরে রাখছে, তারা নিতান্তই খুনে। এদের কোনও স্বাজাত্যভিমান বা দেশপ্রেম নেই, ভাড়াটে খুনে মাত্র। এরা হয়তো ববি রায়কে বাগে পাওয়ার জন্য একটা প্লেনকে হাইজ্যাক করবে না। কিন্তু সাবধানের মার নেই।

যাত্রীদের সংখ্যা অনেক। সকলকে সমানভাবে লক্ষ করা সম্ভব নয়। গোটা লাউঞ্জটাকে কয়েকটা কাল্পনিক জোন-এ ভাগ করে নিলেন ববি। তারপর জোন ধরে ধরে লোকগুলোকে লক্ষ করে যেতে লাগলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পর দুটো লোককে চিহ্নিত করলেন ববি রায়। দুজনেই শীতের জ্যাকেট পরেছে। পরনে চাপা ট্রাউজার। কাঁধে একজনের স্যাচেল ব্যাগ। অন্যজনের হাতে একটা ডাক্তারি কেস।

লোকদুটো তার দিকে একবারও তাকায়নি।

প্লেনে ওঠার সময় বলি বা লোকদুটির পিছনে রইলেন। কোথায় বসে, তা দেখতে হবে।

বিশাল এয়ারবাসে কোনও লোকের হদিশ ল’খা খুবই শক্ত। তার ওপর আজকাল প্লেনে ফার্স ক্লাস তার অর্ডিনারি ক্লাস তালাদা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ববি রায়ের টিকিট কোর্স ক্লাসের। নিজের প্রকোষ্ঠে ঢুকবার আগে ববি রায় হোঁচট খাওয়ার ভান করে একটু সময় নিলেন। লোক দুটো প্লেনের বাঁ ধারে পনেরো নম্বর রো-র জানালার দিকের সিট নিয়েছে বলে মনে হল।

ববি রায় উদ্বিগ্ন হলেন না। এর আগেও বহুবার তিনি বিপদে পড়েছেন। একাধিকবার তাকে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হয়েছে। প্যারিসে এক টেররিস্ট দলের জন্য একবার তাকে আগুনে-বোমাও বানিয়ে দিতে হয়েছিল পিস্তলের মুখে বসে। ছেলেগুলো খুবই বোকা, তারা বুঝতে পারেনি, বোমা তৈরি হয়ে গেলে সেটা বলি বা তাদের ওপরই ব্যবহার করতে পারেন।

এক কাপ কফি খেয়ে ববি রায় বোম্বে পর্যন্ত টানা ঘুমোলো। সকালের ফ্লাইট ধরতে সেই মাঝরাতে উঠে পড়তে হয়েছে।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল অবধি কোনও ঘটনা ঘটবে না, এটা ববি রায় জানতেন। ট্যাক্সিতে ববি এত জুতোর ফাঁপা হিল থেকে লিলিপুটটাকে বের করে পকেটে রাখলেন।

একবার আন্তর্জাতিক বিমানে উঠে পড়লে তার অনুসরণকারীরা বোধহয় তার নাগাল পাবে না। যা কিছু তারা করে প্লেনে ওঠার আগেই। ফাইভ স্টার হোটেলের নির্জন সুইট এসব কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই।

ববি রায় তাঁর নির্দিষ্ট হোটেলে আগে থেকে বুক করা ঘরে চেক-ইন করলেন। গরম জলে ভাল করে স্নান করালে, ব্রেকফাস্ট খেলেন। খবরের কাগজে চোখ বোলালেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সমূদ্রও দেখলেন। সবচেয়ে বেশি লক্ষ করলেন, নীচের ব্যালকনিটায় কেউ নেই।

তারপর খুব ধীরে-সুস্থে পোশাক পরলেন। অ্যাটাচি কেস ছাড়া তাঁর সঙ্গে কোনও মালপত্র নেই। দরকারও হয় না। প্যারিসে তার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সবই আছে সেখানে।

কিন্তু এই অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বেরোলে অনুসরণকারীদের সন্দেহ হতে পারে যে তিনি হোটেল ছেড়ে পালাচ্ছেন। ববি রায়ের যতদূর ধারণা, তার অনুসরণকারীরা এই ফ্লোরে ঘর নিয়েছে। অপেক্ষা করছে। লক্ষ রাখছে।

কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন ববি।

আমার দুই বন্ধুর এই হোটেলে চেক-ইন করার কথা। কেউ কি করেছে এর মধ্যে?

বেয়ারা মাথা নাড়ল, দু'জন সাহেব পঁচিশ নম্বর ঘরে এসেছেন। মিস্টার মেহেরা আর মিস্টার সিং।

ববি রায় উজ্জ্বল হয়ে বললেন, ওরাই, ঠিক আছে।

কোনও খবর দিতে হবে, স্যার?

না। আমি নিজেই যাচ্ছি।

বেয়ারা চলে গেলে ববি রায় উঠে আটাচি কেসটা খুলে আর-একটা গুপ্ত প্রকোষ্ঠ থেকে খুব সরু নাইলনের দড়ি বের করলেন। অ্যাটাচি কেসটা দডিতে ঝুলিয়ে ব্যালকনি থেকে খুব সাবধানে নামিয়ে দিলেন নীচের ব্যালকনিতে।

তারপর শিস দিতে দিতে দরজা খুলে বেরোলেন। পচিশ নম্বর ডানদিকে, সিঁড়ির মুখেই। ববি জানেন।

পঁচিশ নম্বরের দরজাটা যে সামান্য ফাঁক তা লক্ষ কবলেন ববি রায়। ভাল, খুব ভাল। ওরা দেখছে, ববি রায় খালি হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং এখনই পিছু নেওয়ার দরকার নেই। শিকারকে তত ফিরে আসতেই হবে।

লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে তবু ববি আয়ের শিরশির করছিল। যদি এইসব রাফ স্বভাবের খুনি সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার চালায় এখন?

না, অত মোটা দাগের কাজ করবে না। করিডোরে ব্যস্ত বেয়ারদের আনাগোনা রয়েছে। ওরা অপেক্ষা করবে।

লিফটে ঢুকে ববি রায় নীচের তলার পূহঁচ টিপলেন, লিট থামতেই চকিত পায়ে নেমে পড়লেন। পকেট থেকে একটা স্কেলিটন চাবি বের করে একটা স্যুইটের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন।

এবং তারপরই বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। ঘরে লোক আছে। বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে। শোওয়ার ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে। অথচ বারান্দায় তার অ্যাটাচি কেস। কিন্তু ভাববার সময় নেই। ববি রায় সাবধানে শাওয়ার ঘরের দরজাটা সামান্য খুললেন।

ঘুম জড়ানো গলায় এক বাপ তার ছেলের সঙ্গে কড়া ভাষায় কথা বলছে।

ববি রায় দরজায় নক করলেন।

হু ইজ ইট?

হোটেল ইন্সপেক্টর, স্যার। ইজ এভরিথিং ক্লিন?

ইয়াঃ।

লেট মি সি স্যার? মে আই কাম ইন?

কাম ইন।

ববি রায় ঘরে ঢুকলেন। চারদিকটা দেখলেন, ব্যালকনিতে গিয়ে দ্রুত দড়িটা খুলে পকেটে রাখলেন। অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিয়ে চলে এলেন।

ইটস ওকে, স্যার। থ্যাংক ইউ।

অঃ রাইট।

ববি রায় বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলেন নাচে। হোটেলের বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলেন।

হোটেলের বিলটা দেওয়া হল না। সেটা পরে পাঠালেও চলবে। আপাতত ভিন্ন একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার।

থ্রি স্টার একটা হোটেলে এসে উঠলেন ববি রায়। একটু ভিড় বেশি। তা হলেও অসুবিধে কিছু নেই। তিনি সব অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারেন।

দরজা লক করে ববি রায় পোশাক ছাড়লেন। তারপর ঘুমোলেন দুপুর অবধি।

ধীরেসুস্থে লাঞ্চ খেলেন হোটেলের রেস্তোরাঁয়, ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তিনি কি নিরাপদ? তিনি কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? তা হলে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কেন?

ববি রায় বিশাল রেস্তোরার চারদিকে একবার হেলাভরে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

তারপর আবার যথেষ্ট ক্ষুধার্তের মতোই খেতে লাগলেন নিশ্চিন্তে।

না, ববি রায় তাঁর দু'জন অনুসরণকারীকে বোকা বানালেও সব বিপদ ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। বোধ হয় ফাইভ স্টার হোটেলের লবিতে ওদের লোক ছিল। হদিশ পেয়েছে।

বাঁ দিকে চারটে টেবিলের দূরত্বে বসে আছে দুজন। সেই দু’ জন।

৬. খাওয়া শেষ করে ববি রায় উঠলেন

খাওয়া শেষ করে ববি রায় উঠলেন, অতিশয় ধীর-স্থির এবং রিল্যাক্সড দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু ববি রায়ের ভিতরে যে কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্কটি আছে তা ঝড়ের বেগে কাজ করে যাচ্ছিল।

লবিতে বা বাইরে ওদের নজরদার আছে। সুতরাং হোটেলের বাইরে ওদের মোকাবেলা করা শক্ত হবে। তার চেয়ে হোটেলের ভিতরেই একটা ফয়সালা করে নেওয়া ভাল। নাছোড় এ দুটি লোককে না ছাড়ালে চলবে না।

খুব ধীর পায়ে গুনগুন করে বিদেশি গান গাইতে গাইতে ববি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন, ঘর খুললেন, দরজা বন্ধ করলেন, তারপর দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এসব কাজে যথেষ্ট ধৈর্যের দরকার হয়।

কিন্তু প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও কিছুই ঘটল না।

ববি রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দরজা খুলে বেরোলেন। করিডোর ফাঁকা! আততায়ীদের চিহ্নও নেই।

তা হলে?

ববি ধীর পায়ে হোটেল থেকে বেরোলেন। বোম্বেতে তার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আছে। একবার ফোন করলেই সাগ্রহে তারা তাকে এসে তুলে নিয়ে যাবে! পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তিনি পেয়ে যেতে পারেন! ববি রায় যে এক মূল্যবা। মস্তিষ্ক এ কথা আজ কে না জানে! কিন্তু ববি রায় এও জানেন যে, ওভাবে কেবল বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু

কে বা কারা তাঁর পিছু নিয়েছে, কেনই বা, এসব কোনও দিনই জানা যাবে না। বিপদের বীজ থেকেই যাবে।

বোম্বে শহরে ট্যাক্সি পাওয়া সহজ। ববি ট্যাক্সি নিলেন। কোথায় যাবেন তা কিছু ঠিক করতে পারলেন না, চক্কর দিতে দিতে অবশেষে মেরিন ড্রাইভে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে নামলেন। সমুদ্র তার চিরকালের প্রিয়। সমুদ্র তাঁর মাথাকে পরিষ্কার করে দেয়, তাকে চনমনে করে তোলে।

ফুটপাথ থেকে লাফ দিয়ে বাঁধের ওপর উঠে পড়লেন ববি রায়। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে সমুদ্রের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ভূখণ্ড। সেই আক্রোশে সমুদ্র ফুঁসে উঠে লক্ষ ফণায় ছছাবল মারছে অবিরাম। তলায় রাশি-রাশি কংক্রিটের টুকরো ফেলে সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রবল তাড়নায় সমুদ্রের আছড়ে পড়া জল তীক্ষধার লক্ষ বিন্দু হয়ে ছুটে আসছে ওপরে। খরশান ফোয়ারার মতো, বাত্যাতাড়িত বৃষ্টির মতো ভিজিয়ে দিচ্ছে পথচারীকে।

ববি রায় সামান্য ভিজে গেলেন। জল ঘুরছে, দোল খাচ্ছে, ফেনিল হয়ে যাচ্ছে অবিরল পরিশ্রমে। তবু বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই।

বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে চারপাশে। ববি রায় যতদূর লক্ষ করলেন, তার পিছু নেয়নি কেউ। কিন্তু ববি রায় জানেন, নজর ঠিকই রাখা হয়েছে তার ওপর।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁধ শেষ হয়ে গেল। সামনেই চমৎকার একটি সি-বিচ। এই অবেলাতেও কত লোক স্নান করছে। বড় বড় ছেলেরা নির্লজ্জ ল্যাংটো হয়ে ঢেউয়ের মধ্যে দৌড়োচ্ছে। উড়ছে রঙিন বল। বড় বড় বর্ণালি ছাতার তলায় ঠান্ডা পানীয় নিয়ে বসে আছে মেয়ে এবং পুরুষ।

ববি রায় একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসলেন। একটা ঠান্ডা পানীয় নিলেন। তারপর সমুদ্রের দিকে চেয়ে প্রায় সব কিছুই ভুলে গেলেন।

পানীয়টি শেষ হয়ে গেল এক সময়ে। ববি রায় ঘড়ি দেখলেন। তাড়া নেই। উঠলেন।

চড়া রোদ এবং তপ্ত বালিয়াড়ি থেকে উঠে আসা কম্পমান তাপে একটু ঝাপসা লাগল। তবু ববি রায় চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলেন একটু দুরে আর-একটা ছাতার তলা থেকে দু'জন লোক উঠে পড়ল। এরা সেই দু'জন নয়, তবু এরাও মৃত্যুর প্রতিনিধি। ববি রায় জানেন।

পিছনের টেবিলে আরও একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। ববি রায় তাকে লক্ষ করেননি। একটি মিষ্টি মেয়েলি কণ্ঠ বলে উঠল, হিঃ, নিড এ কম্প্যানিয়ন?

ববি রায় ফিরে মেয়েটিকে দেখলেন। নিম্নাঙ্গে একটা সাদা হাফপ্যান্ট গোছের, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা টিশার্ট, নীল সাদা আড়াআড়ি স্ট্রাইপের। দুটি উন্নত স্তন গেঞ্জি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। মেয়েটি ফরসা, বোধহীন লোল হাসি তার মুখে, চোখে লোভ। নইলে এক ধরনের সৌন্দর্যও ছিল। দেখতে তেমন খারাপ নয়। কোমরের চওড়া বেল্টে একটা পেতলের অক্ষর নজরে পড়ল ববির, সি। বয়কাট চুল হাওয়ায় আলুথালু।

ববি একটু শিস দিলেন, তারপর বললেন, কাম অন।

সব মানুষই কি নয় কম্পিউটারের মতো? কিছু ডাটা ফিড করা থাকে। সেই মতো চলে, যেমন ওই ভাড়াটে খুনিরা, তেমনি এই কলগার্লটি।

তিনি নিজে?

কে জানে, তিনি নিজেও হয়তো তাই।

বাড়ানো হাতে কোমরটা পেয়ে গেলেন ববি। শরীরটা যথেষ্ট নমনীয়, যথেষ্ট শক্তি রাখে। বয়সটাও ওর ফেবারে। কিছুতেই কুড়ির ওপর নয়।

তৃষ্ণার্ত গলায় মেয়েটি বলল, লেট আস হ্যাভ এ ড্রিংক ফাস্ট, আই অ্যাম থার্স্টি।

আই নো।

মালাবার হিলসের দিকে অনির্দেশ্য হাত তুলে মেয়েটি বলল, আই হ্যাভ এ জয়েন্ট ওভার দেয়ার। হেইল এ ক্যাব।

ববি রায় এসবই জানেন, কোনও বার-এ যাবে। খদ্দেরের পয়সায় মদ খাবে। ডিনার খেতে চাইবে। নিয়ে যাবে নিজস্ব ঘরে। পকেট ফাঁকা করে ছেড়ে দেবে। রুটিন।

ববি এসবে অভ্যস্ত নন, কিন্তু মেয়েটাকে কভার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্তত একটা ডাইভারশন।

ট্যাক্সি সামনেই ছিল, দু'জনে উঠতেই মেয়েটি ঝুঁকে চাপা স্বরে ড্রাইভারকে একটা নির্দেশ দিল। ববি রায় সেটা চেষ্টা করেও শুনতে পেলেন না। সমুদ্র গজরাচ্ছে, হুড়হুড়িয়ে বইছে হাওয়া।

ববি হেলান দিয়ে আরাম করেই বসলেন। সর্বদাই তাঁকে বেঁচে থাকতে হয় বর্তমান নিয়ে। তার ভাবাবেগ বলে কোনও বস্তু নেই, ভয় তাঁর ভিতরে তেমনভাবে কাজ করে না, তাঁর ভিতরে কাজ করে অঞ্চ এবং কেবলমাত্র অঙ্ক।

ছোট কিয়াট গাড়িটা যখন গুড়গুড় করে চলছে তখন মেয়েটা ববির একটা হাত মুঠো করে ধরল। ববি বাধা দিলেন না দিতে ইচ্ছে হল না বলেই, তবে হাতখানার ভাষা অনুভূতির ভিতর দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নরম ও উষ্ণ হাতখানা কি আগ্রহী? না কি ভীত? দ্বিধাগ্রস্ত?

তোমার নাম কী?

চিকা।

নামটা তো বেশ ভালই।

তোমার নাম?

ববি।

হাতটাকে আরও একটু নিবিড়ভাবে চেপে ধরলেন ববি! হাতটা কি তাকে কোনও তথ্য দিচ্ছে? দেওয়ারই কথা। পৃথিবীর সব জিনিসই সর্বদা কিছু না কিছু তথ্য দেবেই। শুধু সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তা বুঝে ওঠাই যা শক্ত।

গাড়িটা মালাবার হিলস বেয়ে উঠছে। অতি চমৎকার দৃশ্য চারদিকে। অত্যন্ত অভিজাত, নিরিবিলি, খোলামেলা।

ববি চিকার দিকে ঘুরে তাকালেন, এসব কাজের পক্ষে তোমার বয়স বড্ড কম। চিকা সামান্য চমকে উঠল কি? বলির দিকে চেয়ে অকপট বিস্ময়ে বলল, কোন সব কাজ?

ববি স্বগতোক্তির মতো বললেন, মেয়েদের যে কতভাবে ব্যবহার করে মানুষ! শুধু জন্মানোর দোযে মেয়েদের কত না কষ্ট!

বড্ড এলোমেলো হাওয়া, ঢেউয়ের শব্দ। চিকা বোধহয় ববির কথা ভাল শুনতে পেল না। কিন্তু ববির দুঃখিত মুখের দিকে চেয়ে কিছু অনুমান করে নিল। ঝুঁকে প্রায় ববির গালে শাস ফেলে বলল, তুমি কি দুঃখী মায়? বউ ছেড়ে, বুঝি? রাহা, বড় ছেড়ে গেলে প্রথম-প্রথম বড় কষ্ট হয়।

ববি মৃদু হেসে বললেন, ইউ আর এ থটরিডার।

একটা নাল ফিয়াট পিছু নিয়েছে তা বিয়ারভিউ আয়নায় দেখেছেন ববি।

চিকা এক ঘন হয়ে বসল। ববি নিজে পারফিউম মাখেন না কখনও। কিন্তু ফরাসি দেশে তিনি পারফিউমের নানা বিচিত্র ব্যবহারের কথা জানেন। কিছু পারফিউম আছে যা কামোত্তেজক। এই মেয়েটির শরীর থেকে ঠিক কেমই কোনও গন্ধ আসছিল, যা

নাসারন্ধ্রকে স্ফীত করে এবং রক্তকণিকায় একটা অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে দেয়, দ্রুত করে দেয় হৃদস্পন্দন।

চিকা তাঁর কাঁধে মাথা রাখতেই ববি রায় মৃদু স্বরে বললেন, ইউ আর ইন ডেঞ্জার মাই ডিয়ার। মেয়েটি চকিতে মাথা তুলল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট?

মেয়েটিকে বালিকাই বলা যায়। এখনও শরীর ততটা পুরন্ত নয়। চোখে-মুখে এখনও পাপের ছায়া গাঢ় হয়ে বসেনি। জীবনটা এখনও এর কাছে নিতান্তই খেলা-খেলা একটা ব্যাপার। যদিও এই বয়সেই পেশাদার এবং সাহসিনী হয়ে উঠেছে তবু ববির ইচ্ছে হল না এবে কভার হিসেবে ব্যবহার করতে।

ববি ওর হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, আই অ্যাম নট এ গুড পিক, মাই ডিয়ার। এরপর যখন খদ্দের ধরবে একটু দেখেশুনে ধোরো।

মেয়েটি রাগ না। অবাক হয়ে বলল, "কি পাগল? তোমাকে তো আমার অনেকক্ষণ ধরেই ভাল লাগছিল। কেমন দুঃখী, একা, মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছিলে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম তোমার বড় পালিয়ে গেছে। তখনই আমার মনে হল, তোমার জন্য কিছু করতে হবে। আমরা একসঙ্গে মাতাল হব, নাচব, ফুর্তি করব। এর মধ্যে বিপদের কী আছে?

ট্যাক্সি ধীর হয়ে এল। তারপর একটা ঝা-চকচকে বার কাম রেস্তোরাঁর সামনে থামল। ববি রায় দেখলেন, এ হচ্ছে একেবারে নষ্টভ্রষ্ট ছোঁড়াছুঁড়িদের বেলেল্লাপনা করার মতো জায়গা। একটা নির্জন গলির মধ্যে।

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে ববি মেয়েটির হাতে হাত ধরে ঢুকে গেলেন ভিতরে। নীল ফিয়ার্টটা নিশ্চিত থেমেছে কাছেপিঠে। ববি রায় ঘাড় ঘোরালেন না। আলো এত মৃদু যে, বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকলে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার বলে মনে হয়। মেয়েটি হাত ধরে টেনে নিয়ে না গেলে ববিকে কিছুক্ষণ হাতড়াতে হত চারদিকে।

কোণে একটা ফাঁকা একটেরে কিউবিকল। মেয়েটি খুব কাছ ঘেঁষে শরীরে শরীর লাগিয়ে বসল। রেস্তোরাঁয় খদ্দের নেই বললেই হয়।

কী খাবে? পুরুষেরা তো হুইস্কিই খায়। আমি খাব ভোদকা।

ববি শুধু বললেন, এনিথিং ইউ সে।

কাচের দরজাটা ঠেলে দু'জন লোক ঘরে ঢুকল! চারদিকে তাকাল। তারপর আবছা অন্ধকারে কোথাও বসে গেল।

মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল, ইটস এ ম্যাড জয়েন্ট। রাতের দিকে এ জায়গাটা একেবারে ক্রেজি হয়ে যায়।

হ্যাঁ, এ হচ্ছে যৌবনের জায়গা। আমার মতে বুড়োদের নয়।

মেয়েটি ববির গালে একটা ঠোনা দিয়ে বলল, তুমি মোটেই বুড়ো নও। বোসো, আমি টয়লেট থেকে আসছি।

চিকা উঠে যেতেই ববি রায় দুটো জিনিস লক্ষ করলেন। চিকা তার হ্যান্ডব্যাগ সঙ্গে নিয়ে গেছে। সেটা স্বাভাবিকও হতে পারে। মেয়েদের অনেক সাজগোজের জিনিসও হ্যান্ডব্যাগে থাকে। দ্বিতীয়ত চিকা ড্রিংকসের অর্ডার দিয়ে যায়নি। টয়লেট কোনদিকে তা ববি রায় জানেন না, চিকা গেল ডানদিকে। বাইরে বেরোনোর দরজা ওইদিকেই।

ববি রায় পরিস্থিতিটা বুঝে নিলেন চাখের পলকে। ঠিক কম্পিউটারের মতোই। জিন এই রেস্তোরা তার কবরখানা হয়ে উঠতে পারে, যদি সতর্ক না হন তিনি।

ববি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আর এৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, পিছনের কিউবিকলে একটা নড়াচড়ার শব্দ হল। ববি কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে ঘুরে মুখোমুখি হলেন দুটো লোকের।

এক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ মাত্র সময় পাওয়া যায় এসব ক্ষেত্রে। এই চকিত মুহূর্তেই ববি রায় বুঝে নিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আদ্যন্ত পেশাদার, নিরাবেগ, অভিজ্ঞ খুনি।

কিন্তু তারা আক্রমণ করার আগেই যে ববি রায় আক্রমণ করবেন এটা বোধহয় ওরা ভাবতেও পারেনি। আর সেই বিস্ময়ের সুযোগটাই নিলেন ববি রায়।

তাঁর বুটের ডগা যখন প্রথম খুনির হাঁটুতে খটাং করে গিয়ে লাগল তখন হাড় ভাঙার নির্ভুল শব্দ পেলেন ববি রায়।

ওয়াঃ–বলে লোকটা ভেঙে পড়তে-না-পড়তেই দ্বিতীয় লোকটির দিকে লাফিয়ে উঠে বাইসাইকেল চালানোর মতো পা দু'খানাকে শূন্যে তুলে লাফিয়ে যে লাথিটা চালালেন সেটা এড়ানোর কোনও নিয়মই জানা ছিল। লোকটার। এত দ্রুত কেউ পা বা হাত চালাতে পারে তা এ দেশের পেশাদাররাও বোধহয় এখনও ভেবে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় লোকটা শব্দ করল না। পিষ্ট ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে কার্পেটে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

প্রথম লোকটা হাঁটু চেপে বসা অবস্থায় এক অদ্ভুত ভয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ববির দিকে। ববি একটু ঝুঁকে হাতের কানা দিয়ে তার মাথায় মারলেন। লোকটা ঢলে পড়ে গেল।

কয়েকজন বেয়ারা কিছু আন্দাজ করে এগিয়ে আসছিল এদিকে। ববি দাঁড়ালেন না, চোখ- সওয়া অন্ধকারে কয়েকটা টেবিল তফাতে সরে গেলেন।

টয়লেটের দরজায় দাঁড়িয়ে চিকা, ঘটনাস্থলের দিকে চেয়ে ছিল। এখোল না।

ববি রায় দরজার কাছ বরাবর এগিয়ে গেলেন। একবার ফিরে তাকালেন। কেউ তাকে লক্ষ করছে কি? করুক, এখন আর ক্ষতি নেই।

ববি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সেই ট্যাক্সিটা এখনও অপেক্ষা করছে। ববি রায় পিছনের দরজা খুলে ভিতরে উঠে বসলেন।

চলো।

ট্যাক্সি চলতে লাগল। ববি রায় তিক্ততার সঙ্গে ভাবলেন, এইভাবে সারাক্ষণ বেঁচে থাকার কোনও মানে হয়? এই শারীরিকভাবে বেঁচে থাকা এবং অবিরল দ্বৈরথ এটা কোনও ভদ্রলোকের জীবন নয়।

আপাতত পিছনে কোনও উদ্বেগজনক ছায়া নেই। কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিরাপদ। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ নয়।

মেরিন ড্রাইভে ট্যাক্সি বদলালেন ববি। তারপর হোটেলে ফিরলেন।

এখানে নিশ্চয়ই আরও দুটি ছায়া তার জন্য অপেক্ষা করছে!

করুক, ববি রায় তাদের সময় দেবেন।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। ববি ঘরে ঢুকবার আগে সামান্য দ্বিধা করলেন। দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে একটু অপেক্ষা করলেন। কিছু ঘটল না।

ঘরে ঢুকে আলোগুলো জ্বেলে দিলেন, কেউ নেই।

অ্যাটাচি কেসটা গুছিয়ে নিলেন ববি। তারপর রিসেপশনে এসে বিল মেটালেন।

পাঁচতারা হোটেলটায় যখন নিজের ঘরে ফিরে এলেন ববি তখন রাত প্রায় ন’টা।

রাত সাড়ে ন’টায় লীনার ঘরের ফোন বেজে উঠল।

হ্যাল্লো।—একটি আহ্লাদিত কণ্ঠ বোম্বাই থেকে বলে উঠল, কেমন আছেন মিসেস ভট্টাচারিয়া? গাড়ি কেমন চলছে?

এত অবাক হল লীনা যে কথাই জোগাল না মুখে।

শুনুন মিসেস ভট্টাচারিয়া, আমার ফরেন ট্রিপটা বোধহয় ক্যানসেল করতে হচ্ছে। কিন্তু এখনও আমার ফেরার উপায় নেই।

লীনার সমস্ত শরীর রাগে বিদ্বেষে ক্ষোভে ঠকঠক করে কাঁপছিল। চাপা হিংস্র স্বরে সে বলল, ইউ… ইউ স্কাউন্ড্রেল, আপনি ওকে খুন করলেন? আপনাকে আমি পুলিশে দেব।

কাকে খুন করলাম মিসেস ভট্টাচারিয়া?

আপনি জানেন না?

মিসেস ভট্টাচারিয়া, যাকে রোজই দু-চারটে করে খুনখারাপি করতে হয় তার পক্ষে সব ক'জন ভিকটিমকে মনে রাখা কি শক্ত নয়?

ওঃ, ইউ আর হোপলেস!

এখন, নিজেকে একটু গুছিয়ে নিন। মনে করুন, আপনি একজন কম্পিউটার। তথ্য ছাড়া আপনার মধ্যে কোনও আবেগ বিদ্বেষ ক্ষোভ কিছুই নেই। শুধু তথ্যটি দিন মিসেস ভট্টাচারিয়া। কে খুন হল?

আপনি তাকে ভালই চেনেন। আপনি তাকে আমার পিছনে লাগিয়েছিলেন গোয়েন্দাগিরির জন্য। আপনি তাকে—

মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনি কি কুইজ মাস্টার? অবশ্য মেয়েদের ক্ষেত্রে মাস্টার হয় কি না আমি জানি না। মেইড বা মিস্ট্রেস হবে হয়তো। বাইদি বাই, আপনি ইন্দ্রজিতের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

সে খুন হয়েছে?

হয়েছে এবং তাকে খুন করেছেন আপনি।

ববি বিনা উত্তেজনায় বললেন, আপনি তার ডেডবডি দেখেছেন?

না, কিন্তু সবাই দেখেছে। তার অফিসে এখনও রক্ত পড়ে আছে।

খুনটা কখন হল?

বিকেলে। কা

জটা আমার পক্ষে একটু শক্ত মিসেস ভট্টাচারিয়া।

তার মানে?

আপনি যে কেন সব কথারই এত মানে জানতে চান! কাজটা বেশ শক্ত মিসেস ভট্টাচারিয়া, কারণ বম্বে থেকে কলকাতায় কাউকে খুন করার মতো ডিভাইস আমার মতো জিনিয়াসও আজ অবধি তৈরি করতে পারেনি।

আপনি বোম্বে থেকে কথা বলছেন?

হ্যাঁ মিসেস ভট্টাচারিয়া, বিশ্বাস না হয় আপনি লাইন কেটে দিয়ে কলব্যাক করতে পারেন।

আপনি সত্যিই বোম্বেতে?

হ্যাঁ। এবার ঘটনাটা একটু সংক্ষেপে বলুন তো, ফ্রিলগুলো বাদ দেবেন। চোখের জল, আহা-উহু, সেন্টিমেন্ট এসব কোনও কাজের জিনিস নয়। টেলিফোনের বিল বাড়বে।

আপনি... আপনি একটা...

তিন সেকেন্ড পার হয়ে গেল মিসেস ভট্টাচারিয়া।

মিসেস নয়। মিস...

আরও দু’ সেকেন্ড...

আপনি এরকম কেন বলুন তো?

আরও তিন সেকেন্ড...

৭. লীনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল

লীনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, উইল ইউ প্লিজ স্টপ কাউন্টিং মিস্টার রায়?

কাউন্টিং হেল্পস, ইউ নো। সবকিছুই কাউন্ট করা ভাল। নাউ, আউট উইথ ইয়োর স্টোরি।

লীনা ভিতরকার দুর্দম রাগটাকে ফেটে পড়া থেকে অতি কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল, চোখ বুজে এবং ভীষণ জোরে টেলিফোনটা চেপে ধরে। সবেগে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, অল রাইট। বলছি।

লীনা বলল এবং ওপাশে ববি রায় একটি শব্দ না করে শুনে গেলেন। শব্দহীন ফোনে কথা বলতে বলতে লীনার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, লাইন কেটে গেল নাকি!

শুনছেন?

শুনছি। বলে যান।

বিবরণ শেষ হওয়ার পর ববি রায় বললেন, লোকটার মরা উচিত ছিল অনেক আগেই। এ ডাউনরাইট স্কাউন্ড্রেল। সেই খাতাটা এখন কোথায় বলতে পারেন?

কেন?

খাতাটার জন্য কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে।

দ্যাট উইল ড্র এ লট অফ গুড টু ইউ। লোকটাকে আপনি আমার পিছনে লাগিয়েছিলেন কেন তা জানতে পারি?

ওনলি অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট, মিসেস ভট্টাচারিয়া। আমার সেক্রেটারি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানার দরকার ছিল।

আমার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার মধ্যে কোন অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট থাকতে পারে মিস্টার নোজি পারকার?

আমি আপনার পার্সোনাল লাইফে ইন্টারেস্টেড নই মিসেস ভট্টাচারিয়া। ইন ফ্যাক্ট আপনার পাসোনাল লাইফটা খুবই ডাল, ড্রাব, আড্রামাটিক এবং শেমফুল।

ইউ... ইউ...

কিন্তু আপনার লাইফটা হঠাৎ একটা ড্রামাটিক টার্ন নিতে পারে মিসেস ভট্টাচারিয়া। ড্রামাটিক অ্যান্ড ডেঞ্জারাস। আপনার সেই রোমিওটি কোথায়? তার যদি অন্য কোনও কাজ না জুটে গিয়ে থাকে, ইফ হি ইজ স্টিল এ ভ্যাগাবন্ড, তা হলে ওকে আপনার বডিগার্ড হিসেবে ইউজ করুন না কেন! নিতান্ত কাওয়াড়রাও প্রেমে পড়লে অনেক সাহনের কাজ করে ফেলে।

কথায় আছে অধিক শোকে পাথর। লীনার এখন সেই অবস্থা। এইসব গা-জ্বালানো কথায় সে যতখানি রাগবার বেগেছে। আরও রেগে যাওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব! প্রত্যেক মানুষেরই তো একটা বয়লিং পয়েন্ট থাকে, তারপরে আর গরম হওয়া তো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং লীনা পাথর হয়ে এল। এবং খুব শান্ত হিমেল গলায় বলল, হোয়াই শুড আই নিড এ বডিগার্ড?

বিজ ইউ আর ইন মরটাল ডেঞ্জার, মাই ডিয়ার।

ড্রপ দি ডিয়ার বিট। তানি আপনার একটি কথাও বাস করছি না। আমি আজই রিজাইন। কবছি, এক্ষুনি।

তাতেই কি বাঁচবেন?

আপনার মতে অভদ্র, বর্বরের সঙ্গে কাজ করতে আমি ঘেন্না করি। আপনি আমাকে ভয় দেখানোর ছেলেমানুষি চেষ্টা করছেন। আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

আর কয়েক সেকেন্ড পরে থাকুন এবং শুনুন প্লিজ।

আমি আপনার কোনও ব্যাপারেই থাকতে চাই না। আপনি আমাকে একগাদা ভুল কোড দিয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে মজা করেছেন। ইয়ারকির একটা শেষ থাকা উচিত মিস্টার রায়।

তিন মিনিটের ওয়ার্নিং হল এবং ববি এক্সটেনশন চেয়ে নিলেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ভুল কোড নয়। দেয়ার ইজ এ কোড অলরাইট। তবে পারমুটেশন কম্বিনেশন করে বের করতে হবে। একটু মাথা খাটাতে হয় মিসেস ভট্টাচারিয়া, একটু মাথা খাটালেই...

ঝপাং করে টেলিফোন রেখে দিল লীনা। তারপর রাগে ক্ষোভে আক্রোশে একা একা ফুঁসতে লাগল।

ফোনটা রেখে ববি রায় একটু কাঁধ ঝাঁকালেন।

পিছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, কাজটা ভাল হচ্ছে না স্যার।

ববি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি যে চিংড়ি মাছটা খাচ্ছ তার দাম কত জানো?

না স্যার।

আমিও জানি না। কিন্তু দেড়শো টাকার কম হবে না।

ও বাবা! বাকিটুকু কি খাব স্যার? দাম শুনে যে ভারী লজ্জা হচ্ছে।

ববি রায় চিন্তিতভাবে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, শুধু কি চিংড়ি? চিকেন ছিল না? রুমালি রোটি? চিকেন অ্যাসপ্যারাগাস স্যুপ?

ভারী লজ্জা করছে স্যার।

করছে তো?

করছে।

তা হলে আমি যা বলি না করি তা মুখ বুজে মেনে নেবে। বুঝলে?

ইন্দ্রজিৎ সেন চিংড়ির আর-একটা টুকরো মুখে দিয়ে বলল, মেনে না নিয়ে উপায় কী? তবু বলছি মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করছেন না। আপনার মর‍্যালে একটু লাগা উচিত ছিল।

ফের?

ভেবে দেখুন স্যার, আপনার আডভারসারিরা মোটেই সুবিপের লোক নয়। তারা ইনফরমেশনের জন্য খুন অবধি করতে পারে।

কাউকে না কাউকে তো বিপদে পড়তেই হবে। সবাইকে বাঁচিয়ে কি চলা যায়?

তবু উনি আফটার অল একজন মহিলা।

আমার কাছে মহিলাও যা, পুরুষও। ওনলি পার্সন।

আপনি কিন্তু স্যার, একটু জুয়েল-হাটেড আছেন। ওই যে ফোনে বললেন, আমার অনেক আগেই মরা উচিত ছিল এটা থেকেই বোঝা যায় আপনার মায়া-দা নেই।

ইন্দ্রজিৎ, ইউ আর স্টিল ইটিং দ্যাট চিংড়ি। টেস্টফুল, হেলথ গিভিং, কস্টলি। তোমার কৃতজ্ঞতাবোধ নেই?

আমি চিংড়িটার আর কোনও স্বাদ পাচ্ছি না স্যার।

তোমার মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না ইন্দ্রজিৎ! মনে হচ্ছে, ইউ আর ইম্‌মেনসলি এনজয়িং ইয়োর মিল।

ইন্দ্রজিৎ আর-একটা টুকরো মুখে চিবোতে চিবোতে চিবোতে বলল, এদের রান্না যে ভীষণ ভাল স্যার। এনজয় করতে চাইছি না, তবু খাওয়াটা থামাতে পারছি না। ক্যালকাটা টু বম্বে ফ্লাইটে কিছুই খাওয়াল না স্যার। শুধু দু'খানা প্লাস্টিকে মোড়া বিস্কুট আর কফি। বড্ড খিদেও পেয়েছিল। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স যে কী কেপ্পন হয়ে গেছে কী বলব স্যার! তাই খিদের মুখেই খাচ্ছি। তবে স্বাদ অনেকটাই কম লাগছে স্যার।

ববি বায় ভ্রু কুঁচকে ইন্দ্রজিতে দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, ইজ শি স্মার্ট?

বেশ স্মার্ট।

তুমি মার্ডারটা যেভাবে সাজিয়েছ তা কি ফলপ্রুফ?

ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে দুঃখিতভাবে বলল, পৃথিবীতে কিছুই ফুল না স্যার।

মেয়েটা সন্দেহ করবে না তো?

এখনও তো করেনি। কিন্তু আমার খুন হওয়াটা কে সাজাতে হল সেটাই তো বুঝতে পারছি না, স্যার।

তোমার খুব বেশি বুঝবার দরকার কী?

তা অবশ্য ঠিক স্যার। তবে সকালে যে আমি লীনা দেবীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু পুরোপুরি আমার দোষ নয় স্যার। উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিসে এসে পড়েছিলেন।

সেইজন্যই তোমার খুন হওয়াটা দরকার ছিল হাঁদাবাম।

কিন্তু খাতাটা ওকে দেখালেন কেন স্যার? ব্যাপাবটা ফাঁস হয়ে গেল যে, আমিই ওর পিছনে স্পাইং করছি।

সেটারও দরকার ছিল। তুমি বুঝবে না। খাচ্ছ খাও।

ইন্দ্রজিৎ চিংড়ি শেষ করে পুডিং খেতে খেতে বলল, কাজটা ঠিক হল না স্যার।

কোন কাজটা?

মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা।

ইন্দ্রজিৎ, তুমি একটা সত্যি কথা বলবে?

বরাবরই বলে আসছি।

তুমি মেয়েটার প্রেমে পড়োনি তো?

ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজে বলল, এদের পুডিংটা রাজা। ওফ, কী স্বাদ!

আর ইউ ইন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল?

ইন্দ্রজিৎ চোখ নামিয়ে বলল, মেয়েটার চোখ দুটো ভারী ভাল। বু

ঝেছি।

ববি রায় কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন। তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ক্রাইসিসটা যদি কাটে, তা হলে ইউ মে গো অ্যাহেড উইথ দ্যাট গার্ল।

থ্যাংক ইউ স্যার।

কিন্তু ক্রাইসিসটা কাটবে কী করে? ববি রায় আবার চিন্তিতভাবে ঘরজোড়া নরম কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে করতে বললেন, আমি মৃত্যুকে এড়াতে পারি না আর। কিছুতেই না। জাল অনেক ছড়িয়ে পাতা হয়েছে। শোনো ইন্দ্রজিৎ...

বলুন স্যার।

আমার মৃত্যুর আগে ইনফরমেশনটা কিল করা চলবে না। কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তা কি করতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?

পারছি স্যার।

ভুল করলে চলবে না ইন্দ্রজিৎ।

ভুল হবে না স্যার।

আমাকে খুন করার পর মেয়েটাকে ওরা খুন করার চেষ্টা করতে পারে। অন্তত দে উইল পাম্প হার ফর ইনফরমেশন টেক কেয়ার ইন্দ্রজিৎ। মেয়েটা যেন খামোখা না মরে।

কিন্তু আপনি কখন খুন হবেন স্যার?

ববি রায় অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন। জানলার পরদা সরিয়ে বাইরে চেয়ে বললেন, ওই যে সব দূরে দূরে বাড়ি রয়েছে, ওখান থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেল তাক করে গুলি চালানো হতে পারে।

ও বাবা!

ববি রায় ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমার খাবারে বিষ মেশানো হতে পারে।

মাই গড!

ইন ফ্যাক্ট, ইন্দ্রজিৎ, তুমি এতক্ষণ ধরে যেসব সুস্বাদু খাবার খেলে তার মধ্যে সায়ানাইড থাকলে আমি অবাক হব না।

ইন্দ্রজিৎ করুণ মুখ করে বলল, স্যার, এইভাবেই কি প্রতিশোধ নিচ্ছেন! খাইয়ে, তারপর ভয় দেখিয়ে?

ববি রায় আনমনে পায়চারি করতে করতে বললেন, আরও কতরকম পথ খোলা আছে ওদের কাছে। শুধু সময়টা জানতে পারলে ভাল হত।

হ্যাঁ স্যার। আমাদেরও কত কাজের সুবিধে হয়ে যায় তা হলে। একটা কথা বলব সার?

বলো।

ডিটেকটিভদের রিভলভার বা পিস্তল না থাকলে ভাল দেখায় না।

তুমি আমার পিস্তলটা চেয়েছিলে, না?

হ্যাঁ সার। যদি মরেই যান তা হলে পিস্তলটা অন্তত...

তোমার তো লাইসেন্স নেই ইন্দ্রজিৎ।

থাক। ওটা আমি লুকিয়ে রাখব।

আমার মৃত্যু অবধি অপেক্ষা করো, ইন্দ্রজিৎ।

তাতে কী লাভ স্যার? আপনি মরলে পুলিশ ডেডবডি সার্চ করে ওটা নিয়ে যাবে।

এবার কাকে ক্রুয়েল-হার্টেড মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ?

আপনাকেই স্যার।

কেন?

যে নিজের মৃত্যুটাকেও ওরকম হেলাফেলা করে তার মতো নিষ্ঠুর আর কে আছে?

তুমি আঁচিয়ে এসো, ইন্দ্রজিৎ।

যাচ্ছি স্যার। একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনার গলায় ওই অদ্ভুত সোনার চেনটা কেন স্যার?

ওটা চেন নয়।

তা হলে?

স্যাক্রেড থ্রেড। পৈতে।

তার মানে?

ছেলেবেলায় আমার একবার পেতে দেওয়া হয়েছিল। মা বলেছিল, এ ছেলে তোত পৈতে গলায় রাখবে না, ছিঁড়ে গেলে ফেলে দেবে। তাই সোনার পৈতে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে আছে। কিন্তু আর সময় নেই ইন্দ্রজিৎ, আমাদের এবার উঠতে হচ্ছে।

বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা দিয়ে এল লীনা। তারপর স্টিরিয়োতে গান শুনল বহুক্ষণ। ইংরিজি, রবীন্দ্রসংগীত, সরোদ।

অস্থিরতা তবু কমল না।

সে ডাল, ড্রাব, আনড্রামাটিক এবং শেমফুল জীবন যাপন করে? সে এতই সস্তা? এত খেলো? লোকটা তাকে ভাবে কী?

ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জল খেল লানা। তারপর পেপারব্যাক থ্রিলার খুলে বসল। কোনও লাভ নেই এসব করে, সে জানে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো এখন অসম্ভব।

বই রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল লীনা। বেশ ঠান্ডা লাগছে। গায়ের গরম চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল সে! ভুতুড়ে নিস্তব্ধ বাড়িতে সে একা জেগে। কোনও মানে হয় না।

ববি রায়? ববি রায়কে সে এতটুকু সহ্য করতে পারছে না। ওই বাফুন, ওই ক্লাউন, ওই বর্বরটাকে আর সহ্য করা সম্ভবও নয় তার পক্ষে। বলে কিনা, তার মরটাল ডেঞ্জার আসছে!

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল লীনা। মাথার ভিতরে টিক টিক করে উঠল। আজ বিকেলে কি তাকে সত্যিই কেউ অনুসরণ করেছিল? যদি করে থাকে, কেন? কেনই বা খুন হল ইন্দ্রজিৎ সেন?

এসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই।

কিন্তু জবাব তো একটা লীনার চাই।

ঘরে এসে লীনা টেবলল্যাম্প জ্বেলে বসে গেল। একটা কাগজে পূর্বাপর ঘটনাবলী সে সাজিয়ে লিখতে লাগল। বড্ড অ্যাবরাপ্ট। হঠাৎ করে ববি বায়ের তাকে ডেকে পাঠানো এবং তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই অস্বাভাবিক এবং দ্রুতগতি। কিন্তু একটা প্যাটার্ন কি ফুটে উঠছে?

সে ববি রায়ের দেওয়া কোডগুলো পরপর লিখল। বয়ফ্রেন্ড থেকে শুরু করে বার্থ ডে, আই লাভ ইউ। পারমুটেশন কম্বিনেশা করতে বলেছিল লোক্টা! কী ছাই পারমুটেশন কম্বিনেশন করবে সে? এর কোনও মানে হয়?

তবে লীনা বুঝতে পারল, রহস্য যদি কিছু থেকেই থাকে তবে তা আছে ওই কম্পিউটারের গর্ভেই। কিন্তু সঠিক কোড না পেলে কম্পিউটার তো মুখ খুলবে না।

তা হলে?

টেবিলের ওপর হাতে মাথা রেখে ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত লীনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে টের পেল, দাড় টনটন করছে, হাত ঝনঝন করছে।

নিয়মমাফিক ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম আর আসন করে সে খুব গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

সাজগোজ সেরে আজ অনেক আগেই অফিসে বেরিয়ে পড়ল সে।

ববি রায়ের ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজা লক করল লীনা। তারপর কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে এস।

রয় লাভ।

নো অ্যাকসেস।

দাঁতে দাঁত টিপে ভাবতে লাগল লীনা। বয়ফ্রেন্ড। আই লাভ ইউ। বার্থ ডে। কী বদমাশ লোকটা। কী অসভ্য! এ মা! বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আই লাভ ইউ করে তারপর বার্থ ডে মানে বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার সংকেত! ছিঃ ছিঃ।

আনমনে লীনা কিছুক্ষণ বসে রইল। লোকটা কি পারভার্ট?

সারা সকাল নানারকম কম্বিনেশন করে দেখল লীনা। কম্পিউটার কোনও সংকেতই দিতে পারল না।

তা হলে কি চিট করেছে লোকটা? তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে?

ববি রায়ের ঘরে অনেকবার টেলিফোন বাজল। সুভদ্র সেক্রেটারির মতো লীনাকে কোকিলকণ্ঠে নজনকে জানাতে হল যে উনি আউট অব স্টেশন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

বিকেলের দিকে আজও আসবে দোলন।

তারা বেড়াবে। কোথাও যাবে। সিনেমা দেখবে গ্রোবে।

কিন্তু রোম্যান্টিক বিকেলটা টানছিল না আজ লীনাকে! টানছিল ববি রায়ের ভিডিয়ো ইউনিট। তার কোড।

কিন্তু কোড আর কিছু বাকি নেই।

লীনার মাথাটা একটু পাগল-পাগল লাগছিল শেষ দিকে। ভিডিয়ো ইউনিটটার দিকে চেয়ে সে বলল, আই হেট ইউ, আই হেট ইউ ববি রায়।

বিদ্যুৎচমক! ববি রায়! আট অক্ষর।

লীনা দ্রুত চাবি টিপল। ববি রায়।

ভিডিয়ো ইউনিটে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল।

লীনা অবাক হয়ে দেখল, ইংরিজি অক্ষরে লেখা, বম্বে রোড ধরে ঠিক পঁচিশ মাইল চলে যাও। বাঁদিকে একটা মেটে রাস্তা। গাড়ি যায়। তিন মাইল। একটা বাড়ি। নাম নীল মঞ্জিল। খুব সাবধান। রিপিট, খুব সাবধান। কেউ যেন তোমাকে অনুসরণ না করে। এই মেসেজটা এক্ষুনি কি করে দাও, প্লিজ।

লীনা মুখস্থ করে নিয়ে, মেসেজটা কিল করে ভিডিয়ো ইউনিট বন্ধ করল।

দোলন এসেছে। রিসেপশন থেকে ফোনে জানাল।

৮. ট্যাক্সিতে বসে ইন্দ্রজিৎ

ট্যাক্সিতে বসে ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার?

মালাবার হিলসের দিকে। একটা বার কাম রেস্টুরেন্টে।

বোম্বাই প্রহিবিটেড শহর, স্যার। এখানে বার কাম রেস্টুরেন্ট নেই।

আছে। প্রাইভেটলি আছে। যেখানে যাচ্ছি সেটা খুবই প্রাইভেট জয়েন্ট। হয়তো আমাদের ঢুকতে দেবে না।

তা হলে কী করবেন?

তোমাকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছি কেন হাঁদারাম? বুদ্ধি খাঁটিয়ে এসব সমস্যার সমাধান করার জন্যই তো?

তা বটে। কিন্তু কাজের আগে ওরকম ফাঁসির খাওয়া খাওয়ালেন, এখন যে শরীর আইটাই করছে, ঘুমও পাচ্ছে।

খাওয়ালাম মানে? জোর করে খাইয়েছি নাকি? তুমিই তো এসে প্রথম কথাটাই বললে, স্যার, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। জাহাজ পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারি। বলোনি?

বলেছি। খিদেও পেয়েছিল। তখন তো স্যার জানতাম না যে খাওয়ার পর আবার কপালে দুঃখ আছে।

বেশি খাও কেন ইন্দ্রজিৎ? বাঙালিরা বড্ড বেশি খায়, তাই কাজ করতে পারে না।

ইন্দ্রজিৎ অমায়িক গলায় বলল, গরিবের তো ওটাই দোষ স্যার, মাগনা খাবার পেলেই দেদার খায়। তবে ভাববেন না স্যার, পারব। ওখানে কি মারপিট হবে? তা হলে অবশ্য...

তোমার মারপিটের ধাত নয় ইন্দ্রজিৎ। আমি জানি। কিন্তু বিপদ ঘটলে অন্তত দৌড়ে পালাতে হতে পারে।

সেটা পেরে যাব। পালানোটা আমার ধাতে খুব সয়।

ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে বসলেন। অনেক রাত হয়েছে। মেরিন ড্রাইভ ফাঁকা। হু হু করছে হাওয়া আর সমুদ্রের কল্লোল। গাড়ি অতি দ্রুত পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছিল।

কত দুরে-স্যার?

বেশি দূরে নয়। নার্ভাস লাগছে না তো ইন্দ্রজিৎ?

না স্যার। তবে আপনার মোডাস অপারেন্ডিটা বুঝতে পারছি না।

আগে থেকে বুঝবার দরকার কী?

আমার ভূমিকাটা কী হবে?

তোমার ভূমিকা খুব সাধারণ। যদি কিছু হয় তা হলে তুমি পালাবে এবং যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পুলিশে একটা খবর দেবে। মিসেস ভট্টাচারিয়াকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবে।

উনি মিসেস নয় স্যার, মিস।

অল দি সেম।

একটু ঝুঁকে ববি ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দেশ দিলেন। গাড়ি বাঁক নিল। একটু বাদে যেখানে ববি গাড়িটা দাঁড় করালেন সে জায়গাটা রেস্টুরেন্টের সম্মুখ নয় বটে, কিন্তু সেখান থেকে রেস্টুঘ্নেন্টটার দরজা দেখা যায়। দিনের বেলায় যেমন ঝা-চকচকে লেগেছিল এখন সেরকম লাগছে না। বাইরে আলোর কোনও খেলা নেই, উজ্জ্বলতা নেই। বরং যেন একটু বেশি অন্ধকারই লাগছিল, একটিমাত্র বালকের আলোয়।

ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ববি রায় নামলেন।

এসো ইন্দ্রজিৎ।

দু'জনে দ্রুত পায়ে এগোল। কয়েকটা নিঝুম গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। গাড়ির চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ মোটরবাইক আর স্কুটার। রাস্তায় কোনও লোকই নেই।

রেস্টুরেন্টের দরজা আঁট করে বন্ধ। একজন গরিলার মতো চেহারার লোক দরজার পাশে অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়ানো, পাথরের মূর্তির মতো।

শান্তভাবে, একটু ঝুঁকে উর্দিপরা একটা হাত বাড়িয়ে গরিলা তাদের বাধা দিল। খুবই নিম্ন, কিন্তু গম্ভীর গলায় বলল, ভিতরে যাওয়া বারণ। তোমরা কী চাও?

গরিলা ইংরিজি বলে, তবে ভাঙা ভাঙা এবং ভুলে ভরা। তবে ভঙ্গিটা বুঝিয়ে দেয় যে, ইংরেজির জন্য নয়, তাকে রাখা হয়েছে আরও গুরুতর কাজের জন্য।

ববি রায় ভারী অমায়িক হেসে বললেন, কাস্টমার। হোয়াট কাস্টমার? গো অ্যাওয়ে।

ববি রায় পকেটে হাত দিলেন। একখানা ভাঁজ করা পঞ্চাশ টাকার নোট প্রস্তুত ছিল। গরিলার হাতে সেটা চোখের পলকে চালান হয়ে গেল।

গরিলা ভ্রু কুঁচকে বলল, নো কিডিং।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ধরল গরিলা। উদ্দণ্ড নাচ-গান চেঁচামেচির শব্দ তেড়ে এল ভিতর থেকে। কানের পরদায় ধাক্কা দিল উন্মত্ত ড্রামের আওয়াজ। দু'জনে টুক করে ঢুকে গেল ভিতরে।

ধোঁয়া, শব্দ, ক্যালেডিয়োস্কোপিক আলোর খেলায় যৌবনের প্রলাপ সমস্ত ঘরটাকে, যেন ভেঙেচুরে ফেলছে। পায়ের তলায় সুস্পষ্ট ভূমিকম্প। চোখ জ্বালা করে, মাথা পাগল-

পাগল লাগে। অন্ধকার ও আলোর এমনই পাগলা সমন্বয় এবং দ্রুত অপস্রিয়মাণ নানা রং যে ভিতরটায় প্রকৃতই কী হচ্ছে তা বোঝা যায় না। তবে মেঝের অনেকটা পরিসর ফাঁকা করে তৈরি হয়েছে নাচের জায়গা। সেখানে ভুতুড়ে অবয়বের বহু মেয়ে আর পুরুষের শরীর বাজনার আদেশে সঞ্চালিত হচ্ছে বহু ভাঙ্গমায়।

ইন্দ্রজিৎ প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কানে এল ববি রায়ের কঠিন স্বর, চলে এসো, সময় নেই।

কোথায় স্যার?

কাম অন। আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট গার্ল।

ইন্দ্রজিৎ আর শব্দ করল না। ববি রায়ের পিছু পিছু এগোতে লাগল। গাঁজা, চণ্ডু, চরস, মদ কী নেই এখানে? নেশার জগৎ যেন কোল পেতে বসে আছে।

ববি রায় নৃত্যপর নর-নারীর ভিতর দিয়ে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সোজ কথায়, তাঁকেও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে নেচে নিতে হচ্ছিল। ইন্দ্রজিৎ অতটা পেরে উঠছিল না। তার আর ববি রায়ের মাঝখানে দোল-খাওয়া স্কুল-খাওয়া নানা শরীর এসে পড়ছে। কখনও মেয়ে, কখনও পুরুষ, কখনও জোড়া।

হাঁফাতে হাঁফাতে ইন্দ্রজিৎ বলল, স্যার, আমি যে আপনার মতো নাচতে জানি না, এগোব কী

করে?

ববি রায় তার দিকে দৃকপাত না করে বললেন, সামটাইম উই ডোন্ট ড্যান্স ইন্দ্রজিৎ, বাট উই আর মেড টু ড্যান্স। তোমাকে নাচতে হবে না, ধাক্কা দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে চলে এসো। দে ওন্ট মাইন্ড।

নাচের ফ্লোরটা অনায়াসে পেরিয়ে গেলেন ববি। আর সঙ্গে সঙ্গেই একজন বিশাল চেহারার যুবক তড়িৎগতিতে এসে তার একটা হাত ধরে ফেলল শক্ত পাঞ্জায়, ওয়েট এ মোমেন্ট প্লিজ, আর ইউ এ মেম্বার? দিস প্লেস ইজ ওপেন ফর পাবলিক ওনলি আপ টু সেভেন পি এম। আফটার সেভেন ইটস এর মেম্বারস ওনলি।

ববি রায় চিন্তিত মুখে যুবকটির দিকে তাকিয়ে খুব ভদ্র গলায় বললেন, না, আমি মেম্বার নই। তবে আমার এক বন্ধু আমাকে এখানে নেমন্তন্ন করেছিল। তার নাম চিকা।

দৈত্যাকার যুবকটি কি একটু ধন্দে পড়ে গেল? সামান্য একটু দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সে মাথা নেড়ে বলল, চিনি না। কে চিকা?

খুব সুন্দর একটি মেয়ে।

চিকা বলে কেউ এখানে নেই।

ববি রায় অত্যন্ত অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তার সঙ্গে যে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। রোম্যান্টিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

যুবকটি ববি রায়কে ক্রূর চোখে অপাঙ্গে দেখে জরিপ করে নিচ্ছিল। হঠাৎ বলল, এখানে তুমি ঢুকলে কী করে?

চিকা বলেছিল, ডোরম্যানকে ঘুষ দিলে ঢোকা যায়।

মাই গড, ইউ ব্রাইবড দা ডোরম্যান?

আই ডিড। ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

কোথায়?

এদিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার একটা চোরা পথ আছে। ডোন্ট স্পয়েল দা শশা। গেট আউট অফ হিয়ার।

ইন্দ্রজিৎ পিছন থেকে একটু কাঁপা গলায় বলল, তাই চলুন, স্যার।

ববি রায় ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরে খুব শীতল গলায় ইংরেজিতে বললেন, যাও, আমাদের ফোর্সকে সিগনাল দাও। তারা এবার ঢুকে পড়ুক।

এ কথায় যুবকটি যেন হঠাৎ কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। ববির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বিবর্ণ মুখে বলল, তুমি পুলিশের লোক? কিন্তু... কিন্তু আমরা তো প্রাইভেট। পুলিশকে আমরা কখনও ফাকি দিই না...

ববি একটা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, যাও ইন্দ্রজিৎ, ডেকে আনো।

যুবকটি টপ করে এগিয়ে এসে ইন্দ্রজিতের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, জাস্ট এ মোমেন্ট। চিকাকে তোমাদের কী দরকার?

ববি রায় হিম-শীতল গলায় বললেন, দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস, মিস্টার হাসলার। গিভ মি হার হোয়ার অ্যাবাউটস।

দেন হোট? উইল ইউ লিভ?

আই শ্যাল।

কাম উইথ মি।

যুবকটি ঘরের শেষ প্রান্তে একটি কাউন্টারের পিছনে একখানা কাচে ঢাকা ঘরে তাদের নিয়ে গেল। কাচের ঘর বলেই বাইরের শব্দ ভেতরে ঢোকে না।

যুবকটি দু’জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ববির দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে বলল, তোমার আইডেনটিটি কার্ড দেখাও।

ববি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে তাকে সম্মোহিত করার অক্ষম একটা চেষ্টা করতে করতে পকেটে হাত দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। সে জানে, ববি রায়ের ডান পকেটে রিভলভার থাকে। সে আরও জানে, ববি রায় যখন-তখন যা-খুশি করে ফেলতে পারেন। লোকটার হার্ট বলে কিছু নেই।

কিন্তু চোখ খুলে ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে দেখল, ববি রায় একটা আইডেনটিটি কার্ড যুবকটির নাকের ডগায় খুলে ধরে আছেন। তারপর সেটাকে পকেটে পুরে বললেন, ড্রাগ জয়েন্ট বাস্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। চিকার বিরুদ্ধেও অভিযোগ কিছু নেই। সে আমাকে একটা ব্যাপারে একটুখানি সাহায্য করবে। ব্যস।

যুবকটি অবিশ্বাসের চোখে ববি রায়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর টেবিল থেকে একটা প্যাড নিয়ে দ্রুত হাতে একটা ঠিকানা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে ববি রায়ের হাতে দিয়ে বলল, নাউ গেট আউট। প্লিজ।

ববি রায় নির্লজ্জের মতো যুবকটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আর ডোোরম্যানকে যে ঘুষটা দিতে হয়েছে সেটার কী হবে?

যুবকটি দ্বিরুক্তি করল না, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকাটা দিয়ে দিল।

ববি রায় চলে আসতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন। যুবকটি তখনও সন্দেহকুটিল চোখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। ববি রায় অমায়িকভাবেই বললেন, আমি জানি, তুমি চিকাকে এখন টেলিফোন করে সাবধান করে দেবে। আমি হয়তো এই ঠিকানায় গিয়ে ওকে পাব না। কিন্তু মনে রেখো, আই ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক। আই শ্যাল বি ব্যাক বিফোর লং।

এই হুমকিতে কতদূর কাজ হল কে জানে। তবে যুবকটি কোনও জবাব দিল না। যেমন চেয়ে ছিল তেমনই অপলক চেয়ে রইল। তার পাথুরে দৃষ্টিতে কোনও ভাবের প্রকাশ নেই। খুনিদের দৃষ্টিতে থাকেও না।

ট্যাক্সিওয়ালা ঘুমোচ্ছিল। ববি রায় তাকে মৃদু স্বরে ডেকে জাগালেন। মোটা টাকার চুক্তিতে ট্যাক্সিওয়ালা যদৃচ্ছ যাওয়ার করে রাজি হয়েছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, অব কাঁহা সাব?

বান্দ্রা।

ট্যাক্সি চলল। ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন।

স্যার, আমিও কি আপনার মতো একটু ঘুমিয়ে নেব?

আমি ঘুমোচ্ছি না, ইন্দ্রজিৎ। সহজে আমার ঘুম আসে না।

আমার আসছে।

তুমি ঘুমোও।

ইন্দ্রজিৎ একটা হাই তুলে বলল, স্যার, আপনি কি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন না?

না। মনে রেখো, এখন আমার পালানোর পথ নেই। এয়ারপোর্টের রাস্তায় ওরা অ্যামবুশ করবে। হোটেলের ঘরে হানা দেবে। রাস্তায় আক্রমণ করবে। আমার এখন একটাই পথ খোলা। ওরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই ওদেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া।

আপনি আমাকে বলছিলেন যে, এরা ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া গ্রুপ। এরা একা কাজ করে না। এদের অর্গানাইজেশন বিরাট। তা হলে আপনি একা কী করবেন, স্যার?

বোকা ছেলে! আমি যে কিছু করতে পারব তা তো বলিনি। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে বলে করে যাচ্ছি। বাংলায় কী একটা কথা আছে না, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!

আছে স্যার। কিন্তু আপনার কি বাঁচবার কোনও আশাই নেই?

মনে তো হচ্ছে না। ইন্ডিয়ান মাফিয়ারা ততটা এফিসিয়েন্ট নয়। অর্গানাইজেশনও দুর্বল। তাই আমি এখনও বেঁচেবর্তে আছি। আর শুধু মারলেই তো হবে না। আমার কাছ থেকে একটা ইনফরমেশনও যে ওদের বের করে নিতে হবে।

তা হলে আপনার কোনও আশাই নেই দেখছি।

ঠিকই দেখছ।

তা হলে এইবেলা রিভলভারটা আমার কাছে দিয়ে দিন না! দরকার হলে আমিই চালিয়ে দেব গুলি।

তোমাদের বাংলায় আরও একটা কথা আছে ইন্দ্রজিৎ, বাঁদরের হাতে খন্তা।

আছে স্যার।

তোমার হাতে রিভলভারও যা, বাঁদরের হাতে খন্তাও তাই।

তা হলে একটু ঘুমোই স্যার! শরীরটা টি টিস করছে। একটা কথা স্যার, আপনি লোকটাকে একটা আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়েছিলেন। ওটা কিসের কার্ড?

ববি রায় প্রশ্নটার জবাব দিলেন না। ইন্দ্রজিৎ হতাশ হয়ে চোখ বুজল। ট্যাক্সি যখন বান্দ্রায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তখন দেড়টা বেজে গেছে। পাড়া নিঃঝুম।

মস্ত একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে ববি আর ইন্দ্রজিৎ একটু স্তব্ধ হয়ে রইল।

এবার স্যার?

শাট আপ। এসো।

ববি রায় কাগজটা খুলে আবার দেখলেন। চিকন মেহেতা। লালওয়ানি অ্যাপার্টমেন্টস। সাততলা।

লিফটে উঠে ববি রায় বললেন, চিকা রেডি আছে, বুঝলে ইন্দ্রজিৎ?

থাকবেই তো স্যার। আপনার সঙ্গে অত ভাব-ভালবাসা।

ইয়ারকি কোরো না ইন্দ্রজিৎ। বাঘের খাঁচায় ঢুকতে যাচ্ছ, এটা মনে রেখো। চিকাকে ওরা অ্যালার্ট করেছে। দারোয়ান যখন রাত দেড়টায় কাউকে ঢুকতে দেয় তখন বুঝতে হবে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। ঘুমটা ঝেড়ে ফেলে অ্যালার্ট হও।

লিফট সাততলা উঠে এল নিঃশব্দে। ববি রায় এবং ইন্দ্রজিৎ নেমে এল। করিডোর নানা দিকে চলে গেছে। ববি রায় দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিলেন।

বাঁদিকে করিডোরটা গিয়ে দুটো দিকে মোড় নিয়েছে। ডান দিকে চিকা ওরফে চিকনের ফ্ল্যাট।

বোম্বেতে এখন এরকম ফ্ল্যাটের ভাড়া কত স্যার?

আকাশপ্রমাণ।

তা হলে মহিলা বেশ মালদার বলতে হবে।

তা বটে।

ববি ডোরবেল-এ আঙুল রাখলেন।

দু’বার বাজাবার পর ভিতর থেকে ঘুম-জড়ানো মেয়েলি গলা শোনা গেল, হু ইজ ইট?

এ ফ্রেন্ড। ববি।

হু ইজ ববি?

এ কাস্টমার, ম্যাডাম। ওয়েলদি কাস্টমার।

শীট! আই শ্যাল কল দা পলিস।

ডোন্ট বদার। দিস ইজ পলিস। ওপেন আপ।

ভিতরটা একটা চুপ মেরে রইল।

তারপর চিকা বলল, কী চাও? আমি তো কিছু করিনি।

তা হলে ভয় কী? দরজা খোলো। আমার কয়েকটা কথা আছে। ওয়েট, লেট মি ড্রেস।

একটু বাদে দরজা খুলে যখন চিকা দেখা দিল তখন তার চোখে ভয়, বিস্ময়, ঘুম তিনটেরই চিহ্ন রয়েছে।

ববি চাপা স্বরে ইন্দ্রজিৎকে বললেন, বিশ্বাস কোরো না। বোম্বে দিল্লি এখন অভিনয়ে কলকাতার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। এ মেয়েটি দারুণ অভিনেত্রী।

মেয়েটি দারুণ সুন্দরীও স্যার।

চিকা ববির দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, উই মেট ইন দা ইভনিং, ইজনট ইট?

রাইট। কাম ইন। হোয়াই ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড!

আমার এই বন্ধু একেবারেই জলঘট। ভয় নেই।

চিকার ফ্ল্যাট অসাধারণ সুন্দর। নরম একটা ঘোমটা পরানো আলোতেও দামি আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তা কোটিপতিদের ঘরে থাকে।

ববি রায় বসলেন। ইন্দ্রজিৎও।

তারপর ববি রায় বললেন, নাউ টক বিজনেস।

৯. সোফায় একগুচ্ছ ফুল

চিকা সোফায় একগুচ্ছ ফুলের মতো এলিয়ে বসে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, হোয়াট বিজনেস?

ববি চিকার দিকে চেয়ে তাকেও সম্মোহিত করার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বললেন, ওরা কে?

কারা?

যারা আমাদের সি-বিচ থেকে ফলো করেছিল?

কারা ফলো করেছিল?

দু'জন লোক।

আমি জানি না, শুধু জানি, তুমি আমাকে ডিচ করে পালিয়ে গিয়েছিলে।

মিস চিকন মেহেতা, আমি জানি তোমাকে ওরা আমাকে ডাইভার্ট করার জন্য কাজে লাগিয়েছিল মাত্র। তুমি ওদের দলের কেউ নও।

চিকা তার রোবটা একটু ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, আমাকে কেউ কাজে লাগায়নি। চিকা অত চিপ নয়।

টক সেন্স চিকা, আমি তোমাকে এখনই তুলে থানায় নিয়ে যেতে পারি।

পারো না, তুমি পুলিশের লোক নও।

ববি যে তর্কযুদ্ধে এঁটে উঠছেন না, এটা বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ ফিসফিস করে বলল, আপনার আইডেনটিটি কার্ডটা বের করুন না স্যার, রিভলভারটাও।

চুপ করো বন্ধু।

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে গেল। কিন্তু সেটা ধমক খেয়ে নয়, চোখের কোনা দিয়ে সে একটা খুব শব্দহীন সঞ্চার টের পেল। দক্ষ ডিটেকটিভের মতোই চমকে না উঠে খুব ধীরে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, চিকার বেডরুমের দরজা খুলে গেল। অন্ধকার ঘর থেকে দুটো আবছায়া মূর্তি দরজার ফ্রেম জুড়ে দাঁড়াল।

স্যার।

আঃ ইন্দ্রজিৎ!

দয়া করে ঘাড়টা একটু ঘোরাবেন স্যার? বিপদ গভীর।

ববি তাকে আমল না-দিয়ে চিকার দিকে চেয়ে বললেন, কী করে বুঝলে যে আমি পুলিশ নই?

জবাবটা চিকা দিল না, কিন্তু জবাবটা এল ববি রায়ের পিছন থেকে। পরিষ্কার ইংরেজিতে।

আমরা জানি মিস্টার রায়।

দু’ জন লোকের একজন খুব ধীর পায়ে বেরোনোর দরজার দিকে সরে গেল। অন্যজন চিকার পিছুনে গিয়ে দাঁড়াল। দু’জনেরই একটা করে হাত পকেটে।

ববি বিরক্তির চোখে পর্যায়ক্রমে দু’জনের দিকে তাকালেন। তারপর হতাশ গলায় বললেন, এবা তো তারা নয়, যারা আমাকে সি-বিচ থেকে ফলো করেছিল।

চিকার পিছনে দাঁড়ানো লোকটা মৃদু হেসে বলল, তাদের পক্ষে হসপিটালের বিছানা ছেড়ে এখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না মিস্টার রায়। দু'জনেরই কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর।

ববি রায় বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। বিষণ্ণ গলায় বললেন, ওরা নভিস, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা নও।

না, মিস্টার রায়, আমরা সম্পূর্ণ পেশাদার। উই নো আওয়ার বিজনেস।

ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে খুব আয়েস করে বসলেন। বললেন, দেন টক বিজনেস।

চিকা উঠল। খুব লীলায়িত ভঙ্গিতে শরীরের সমস্ত উঁচুনিচু জায়গাগুলিকে খেলিয়ে আড়ামোড়া ভাঙল। একটা মিষ্টি হাই তুলে বলল, কারও ড্রিংকস চাই?

কেউ জবাব দিল না।

শুধু ইন্দ্রজিৎ চাপা গলায় বলল, স্যার মাগনা একটু ব্র্যান্ডি মেরে নেব? শুনেছি ব্র্যান্ডি খুব বলকারক। নার্ভাসনেসও কেটে যায় ব্র্যান্ডিতে।

না ইন্দ্রজিৎ, তোমাকে খুব নরমাল থাকতে হবে।

তা হলে একটা সিগারেট ধরাই?

ওরা ধরাতে দেবে না। পকেটে হাত দিলেই গুলি চালাবে। ও বাবা! তা হলে দরকার কী? স্মোকিং আমি চিরতরেই ছেড়ে দিচ্ছি স্যার।

ববি লোকটার দিকে চেয়ে ছিল। চিকা ববির দিকে অর্থপূর্ণ একটু হাসি আর কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে যেন ভেসে ভেসে শোওয়ার ঘরে চলে গেল। ক্লিক শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

চিকার পরিত্যক্ত জায়গায় লোকটা বসল। তারপর বলল, দু’খানা হাত এমনভাবে রাখো যাতে সবসময় দেখা যায়। হঠাৎ কোনও মুভমেন্ট কোরো না। বি ভেরি কেয়ারফুল, উই আর নার্ভাস পিপল।

ববি শান্ত স্বরে বললেন, জানি, আই নো এভরিথিং অফ দিস ট্রেড। নাউ টক বিজনেস, তোমার নাম কী?

কল মি বস।

ববি হঠাৎ ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, শোনো ইন্দ্রজিৎ, যতদূর মনে হচ্ছে এরা বাংলা জানে না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার। তাই বলে রাখছি, যা-ই ঘটুক না কেন তোমাকে কিন্তু পালাতেই হবে।

পালাব? সেই কপাল করে এসেছি স্যার? দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে খোলা রিভলভার।

জানি ইন্দ্রজিৎ। একটা সময় আসবে যখন দু’ জনকেই আমি আমার দিকে ডাইভার্ট করতে পারব। যদি পারি তা হলে তুমি খুব সামান্য সময় পাবে পালানোর, কয়েক সেকেন্ড মাত্র। পালিয়ে কোনও হোটেলে গিয়ে উঠবে। তারপর মিসেস ভট্টাচারিয়াকে ফোন করবে।

মিসেস নয় স্যার, মিস।

একই কথা। যেটা ভাইটালি ইম্পর্ট্যান্ট তা হল মেসেজটাকে কিল করা।

কিন্তু কোডটা স্যার?

আমার নাম। নামটাই কোড। আর একটা কথা। পালাতে পারলে কাল সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরে যেয়ো। লুক আফটার মিসেস ভট্টাচারিয়া। শি ইজ ইন ডেনজার।

বস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার চমৎকার সাহেবি উচ্চারণের ইংরেজিতে বলল, নিজেদের মধ্যে কথা বলে লাভ নেই, সময় নষ্ট হচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ লোকটাকে খুব ভাল করে জরিপ করে নিয়ে মাথা নেড়ে বাংলায় বলল, আপনি পারবেন না স্যার, লোকটার চেহারা দেখেছেন? হাইট ছ'ফুট এক ইঞ্চি তো হবেই। কাঁধ দু'খানা ওয়েট-লিফটারের মতো, হাত দু'খানা বক্সারের, পেটে কোনও চর্বি নেই।

তার চেয়েও খারাপ ওর চোখ দুখানা, ইন্দ্রজিৎ। চোখের দিকে তাকাও, পাক্কা খুনির চোখ।

দু'জনেরই স্যার। দরজার কাছে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকেও একবার দেখুন।

দু'জনকেই দেখা হয়ে গেছে। চুপ করো।

বস ভ্রু কুঁচকে পর্যায়ক্রমে দু' জনকে দেখে নিচ্ছিল। তারপর ববির দিকে চেয়ে বলল, প্রথমে তুমি ওঠো, দেওয়ালের কাছে চলে যাও, দু'হাত উপরে তুলে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও।

ববি বাধ্য ছেলের মতো উঠলেন এবং নির্দেশমতো দাঁড়ালেন।

বস তার স্যাঙাতের দিকে চেয়ে বলল, ফ্রিস্ক হিম।

দ্বিতীয় লোকটা অত্যন্ত দক্ষ ও অভ্যস্ত হাতে ববির পকেট-টকেট হাতড়ে দেখল, তেমন কিছু নেই।

তোমার লিলিপুট পিস্তলটা কোথায়?

হোটেলে ফেলে এসেছি।

বস একটু চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে। বোসো। ওই দ্বিতীয় লোকটি কে?

আমার সঙ্গী।

বস এবার ইন্দ্রজিৎকেও অনুরূপ নির্দেশ দিল। তার কাছে অবশ্য একটা পকেট-নাইফ পাওয়া গেল। একটা রবার হোস-এর টুকরোও, দ্বিতীয়টা মানুষকে ছোটখাটো আঘাত করার পক্ষে চমৎকার। মাথায় মারলে যে-কেউ কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখবে।

বস ববি রায়ের দিকে চেয়ে বলল, এবার কাজের কথা মিস্টার রায়। আমরা কোডটা চাই।

কিসের কোড?

বস হাসল, তুমি শান্তি চাও, না যুদ্ধ চাও?

স্বাধীনতা চাই। আমাদের ছেড়ে দাও।

কথায় কথা বাড়ে। তুমিও অ্যামেচার নও মিস্টার রায়। তোমার অতীত নিয়ে আমরা অনেক রিসার্চ করেছি। ইলেকট্রনিকসে তুমি বিশ্বের পয়লা দশজনের মধ্যে একজন। তুমি যে-কোনও রাডারকে ইলেকট্রনিক তন্তুজাল দিয়ে আচ্ছন্ন আর অকেজো করে দিতে পারো, তুমি যে-কোনও সুপার কমপিউটারের মাইক্রোচিপ বানাবার ক্ষমতা রাখো, তার চেয়েও বড় কথা, তুমি যে ক্রাইটন যন্ত্র বানানোর ক্ষমতা রাখো তা হাজার মাইলের মধ্যে যে-কোনও পরমাণু বোমাকে তার নিজের বেস-এই বিস্ফোরিত করতে পারে। তুমি অতিশয় বিপজ্জনক লোক মিস্টার রায়।

ববি রায় একবার ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি একটি বেসরকারি মাল্টিন্যাশনালের সামান্য কর্মচারী মাত্র। ইলেকট্রনিকসে আমার কিছু হাতযশ আছে ঠিকই, কিন্তু তুমি যা জেনেছ তা হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি। একসময়ে আমি ইলেকট্রনিকস নিয়ে অনেক খেলা খেলেছি বটে, কিন্তু এখন কেবলমাত্র চাকরি করি। চাকরির বাইরে কিছু নয়।

চাকরিটা তোমার ক্যামোফ্লেজ মিস্টার রায়। আমরা সব জানি।

তোমরা আসলে কারা?

আমরা চটে গেলে তোমার শত্রু, খুশি থাকলে তোমার বন্ধু। যুদ্ধ চাও, না শান্তি চাও?

তোমরা কি ভারতীয় মাফিয়া?

বলতে পারো।

তোমাদের বস কে?

জেনে লাভ কী? আমাদের বস অত্যন্ত সম্রান্ত ব্যক্তি। তুমি তার টিকিরও নাগাল পাবে না। তুমি কি আজেবাজে কথা বলে সময় কাটাতে চাইছ? লাভ নেই। আমরা তোমাদের দুজনকে অজ্ঞান করে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব। আমাদের ডেরা খুব ভাল জায়গায় নয় মিস্টার রায়। সেখানে একটা টরচারিং চেম্বারও আছে।

থাকাই স্বাভাবিক। কোডটা বললে কি আমরা মুক্তি পাব?

আমরা অত বোকা নই। কোডটা বলার পর আমরা কলকাতায় আমাদের এজেন্টকে জানাব। সে কোডটা ফিড করবে এবং কমপিউটারের মেসেজ নিয়ে ভেরিফাই করবে। এ কাজে সময় লাগে মিস্টার রায়। ততদিন তুমি আর তোমার বন্ধু আমাদের মহামান্য অতিথি।

এই ফ্ল্যাটেই কি আমরা থাকব?

না, তোমাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে।

ভাল ব্যবস্থা কি? বাথরুম পরিষ্কার? ঘরে কার্পেট এবং টিভি আছে তো? রাঁধুনি কেমন? আমার এই বন্ধু খুব পেটুক।

লোকটা হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, তুমি বড্ড বেশি সময় নিচ্ছ মিস্টার রায়। আমরা তোমাকে আর সময় দিতে পারব না।

ববি রায় চাপা স্বরে বললেন, ইন্দ্রজিৎ তৈরি হও।

বস উঠে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে ববি রায় বসা অবস্থা থেকে হঠাৎ মেঝেয় গড়িয়ে পড়লেন। সোফা ও সেন্টার টেবিলের মাঝখানকার সংকীর্ণ পরিসরে।

ইন্দ্রজিৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, কারণ জীবনে আর কখনও কোনও লোককে সে ডাঙায় সাঁতার কাটতে দেখেনি। আর কী নিখুঁত স্ট্রোক আর গতি! ববি রায় যে ডাঙায় এমন অসাধারণ সাঁতার দিতে পারেন কে জানত? কার্পেটের ওপর পড়েই তিনি চোখের পলকে মেঝের অনেকটা পেরিয়ে গিয়ে বসের গোড়ালিতে কী একটা কারুকাজ করলেন। বস চেঁচিয়ে উঠে এক পায়ে লাফাতে লাগল।

দরজার পাহারাদার নাঙ্গা পিস্তল হাতে ছুটে আসতেই উত্তেজিত ইন্দ্রজিৎ এক লাফে দরজায়।

পালাতে সে সত্যিই ওস্তাদ। দরজাটা খুলে বেরিয়ে যেতে তার কি এক ন্যানো সেকেন্ডও লেগেছে? আলোর গতিবেগকেও কি হার মানায়নি?

ববি রায় যদি ডাঙায় সাঁতার কাটতে পারেন তো ইন্দ্রজিৎও পারে সিঁড়িতে স্কি করতে। বাস্তবিকই সাততলা উঁচু থেকে অতগুলো সিঁড়ি সে একজন সুদক্ষ স্কিবাজের মতোই পেরিয়ে এল।

একতলায় নেমে সে বোকার মতো তাড়াহুড়ো করল না। এসব বাড়িতে দারোয়ানরা সারা রাত চৌকি দেয়। সুতরাং সে খুব শান্তভাবে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

সে জানে, ববি এতক্ষণে খুন হয়ে গেছেন। তবে খুন হওয়ার আগে খুনিদের বিস্তর নাকাল করেছেন নিশ্চিত। বহুত ঝামেলাবাজ লোক।

কিন্তু ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিতের হঠাৎ মনে হল, ববি যদি কোডটা ওদের না বলে থাকেন তা হলে হয়তো এখুনি খুন হবেন না। পরে হবেন।

যাই হোক, আপাতত খুনিরা ইন্দ্রজিতের পিছু নেয়নি, দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেবে।

ইন্দ্রজিৎ একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল, একটা হোটেলে পৌঁছে যেতে তার বিশেষ সময় লাগল না। তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পেয়ে গেল কলকাতার লাইন। লীনার ঘরে টেলিফোন বাজার নির্ভুল শব্দ হচ্ছে।

তিনবার বাজতেই ওপাশ থেকে মেয়েলি গলা বলে উঠল, হ্যালো!

মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ, কে বলছেন?

আমি ববি রায়ের এক বন্ধু।

বন্ধু! কী ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপার ভাল নয় মিস ভট্টাচার্য।

ওঁর কি কিছু হয়েছে?

উনি গভীর বিপদে পড়েছেন।

মারা গেছেন কি?

দৃশ্যটা আমি চোখে দেখে আসিনি। তবে বিশেষ বাকিও নেই। উনি আপনাকে একটা খবর দিতে বললেন। কোডটা হল ববি রায়। মেসেজটা এক্ষুনি কি করা দরকার। পারবেন?

আপনার নামটি কী বলুন তো?

আমার নাম? আসল নাম, না ছদ্মনাম জানতে চান? আসল নামটা এখন বলা যাবে না মিস ভট্টাচার্য। তবে ছদ্মনামটা হল– দাঁড়ান, একটু ভেবে বলি– আমার ছদ্মনামটা হল মহেন্দ্র সিং।

আপনারা দুজনেই কি জোকার? গলাটা চেনা লাগছে কেন বলুন তো?

টেলিফোনে তো সকলের গলাই একরকম লাগে।

মোটেই নয়। যাক গে, ববি রায়ের সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হবে?

ভগবান জানেন।

কারা ওঁকে মারার চেষ্টা করছে?

জানি না, তবে আপনিও সাবধান থাকবেন। আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন মিস ভট্টাচার্য। ববি রায় অত্যন্ত খারাপ লোক, জেনেশুনে একজন মহিলাকে এরকম বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কাপুরুষের কাজ।

দেখা হলে ববি রায়কেও কথাটা বলবেন। হি ইজ এ কাওয়ার্ড।

বলব ম্যাডাম। কিন্তু কোডটার কী হবে? মেসেজটা যে কিল করা দরকার।

ববি রায়কে এ কথাও বলবেন যে আফটার এ লং ওয়াইল্ড গুজ চেজ কোডটা আমিই ভেবে বার করি। ওই মেগালোম্যানিয়াকটা যে নিজের নামটাকেই কোড় হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে এটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল।

আপনি তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী!

ওকে এ কথাটাও বলে দেবেন যে মেসেজটা আজ বিকেলেই আমি কি করে দিয়েছি।

থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এর জন্য ববি রায় নরকে বসেও আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।

ওর আশীর্বাদে আমার দরকার নেই। লেট হিম গো টু হেল।

হি ইজ গোয়িং ম্যাডাম। এতক্ষণে....

লীনা সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

আজ তার ঘুম আসেনি। চোখের পাতা সে এক করতে পারছে না বিছানায় শোওয়ার পর থেকেই।

মাঝরাতের এই ভুতুড়ে টেলিফোনে ঘুমের সামান্য রেশটাও কেটে গেল।

উঠে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, ঠান্ডা বাতাসের হিলিবিলি অনুভব করল শরীরে। অনেকক্ষণ। ববি রায় কি তা হলে মারাই গেছেন? সত্যি?

কেউ মরলে তার কি দুঃখ পাওয়া উচিত নয়? যাই হোক, লোকটা তার কোনও ক্ষতি তো করেনি। একটু-আধটু অপমান করেছে মাত্র। তার জন্য কি লোকটার মৃত্যুতে নির্বিকার থাকা সম্ভব?

কম্পিউটারের রহস্যময় মেসেজটির কথা ভাবছিল লীনা, কোথায় সেই বোম্বে রোড, কোথায় কোন ধান্ধারা গোবিন্দপুরের নীল মঞ্জিল? কার দায় পড়েছে সেখানে যাওয়ার?

লীনা দেখছিল রাস্তায় কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। রোজই থাকে। গ্যারাজের অভাবে কত লোক রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখে।

কিন্তু হঠাৎ লীনার মনে হল, একটা গাড়ির ভিতরে অন্ধকারে একটা সিগারেটের আগুন ধিইয়ে উঠল।

লীনার শরীর শিউরে উঠল হঠাৎ।

১০. শেষ রাতে লীনার ঘুম হল

শেষ রাতে লীনার ঘুম হল বটে, কিন্তু সেই ঘুম দুঃস্বপ্নে ভরা, যন্ত্রণায় আকীর্ণ। বহুবার চটকা ভেঙে চমকে জেগে গেল সে। আবার অস্বস্তিকর তন্দ্রা এল! শেষ অবধি পাঁচটার সময় বিছানা ছাড়ল সে। কিছুক্ষণ আসন আর খালি হাতের ব্যায়াম করল। কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করল শাওয়ারের নীচে সঁড়িয়ে।

তবু চনমনে হল না সে। মনটা কেন যেন ভীষণ ভার। আজ নড়তে চড়তে ইচ্ছে করছে না।

খুব কড়া কালো কফি খেল সে দু'কাপ। গরমে জিব পুড়ে গেল, কিন্তু কফির কোনও শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারল না সে।

একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে পায়ে চটি গলিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফটকের কাছে এল। কাল রাতে যে-গাড়িটাকে দেখা গিয়েছিল সেটা যে কোনটা, তা দিনের আলোয় চিনতে পারল না, ছোট গাড়ি, সম্ভবত ফিয়াট। এর বেশি আর কিছুই আন্দাজ করা যায়নি বারান্দা থেকে।

অবশ্য লীনার মনে হল, সে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। মধ্যরাতে কত লোক কত কাজে বেরোয়। সেরকম কিছুই হবে। মহেন্দ্র সিং নামক জোকারটি অবশ্য তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। সেরকম সতর্কবাণী কি ববি রায় কিছু কম উচ্চারণ করেছে?

ববি রায়। এই চারটি অক্ষর ভাবতে আজ ভারী কষ্ট হল লীনার। যেসব পুরুষেরা মেয়েদের দাবিয়ে চলে, যাদের পৌরুষের অহংকার হিমালয়-প্রমাণ, যারা অতিশয় একদেশদর্শী সেইসব পুরুষ শৌভেনিস্টদেরই একজন হলেন ববি রায়। তবু লোকটাকে যদি সত্যিই কেউ খুন করে থাকে তবে আরও অনেক রাত্রি ধরেই লীনা ঘুমোতে পারবে না। বার বার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙবে।

বাড়িতে থাকতে ভাল লাগছিল না লীনার। আজ সে সময় হওয়ার অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে বলে তৈরি হয়ে নিল।

আজ ব্রেকফাস্ট টেবিলে বহুকাল বাদে তার মা বলল, লীনা ডিয়ার, তোমাকে একটু রোগা দেখাচ্ছে কেন? বেশি ডায়েটিং করছ নাকি?

এ কথা শুনে লীনা ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করল। যা হোক, তার মা তা হলে তাকে লক্ষ করেছে। তবে খুশি হল না লীনা, বলল, থ্যাংক ইউ ফর টেলিং।

তাদের বাড়িতে বাঁধানো বঙ্কিম, বাঁধানো রবীন্দ্রনাথ, বাঁধানো শরৎচন্দ্র আছে, তবু তাদের পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নেই। এ বাড়িতে কারও অসুখ হলে সেবা করতে নার্স আসে বা নার্সিং হোম-এ যেতে হয়। কারও কোনও ব্যক্তিগত সমসা বা সংকট দেখা দিলে তা শুনবার মতো সময় কারও নেই। সবাই এত স্বাধীন ও সম্পর্কহীন যে লীনার মনে হয় সে মরে গেলে এ বাড়ির কেউ কাদবে কি না।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেওয়ার আগে লীনা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ববি রায়। চারটি অক্ষর আবার মনে বিষাদ এনে দিল আজ।

গাড়িটার জটিল প্যানেলের দিকে আনমনে চেয়ে রইল লীনা, বোধহয় বোয়িং ৭৬৭-এর প্যানেলও এরকমই। এত যন্ত্রপাতি, এত বেশি গ্যাজেটস একটা মোটরগাড়িতে যে কী দরকার!

গ্লাভস কম্পার্টমেন্টটা কোনওদিন খোলেনি লীনা। কী আছে ওটার মধ্যে?

লীনা অলস হাতে খোলার চেষ্টা করল। খুলল না, ওপরে একটা লাল বোম রয়েছে। সেটায় চাপ দিল লীনা, তবু খুলল না।

চিন্তিতভাবে একটু চেয়ে রইল সে। এই বুদ্ধিমান গাড়িটার সঙ্গে তার একটা সখ্য গড়ে উঠেছে ঠিকই। যদিও গাড়িটা পুরুষের গলায় কথা বলে, তবু প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জকে মহিলা ভাবতেই ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়েছে লীনাকে। এ গাড়িটা সুতরাং মেয়েই। এই সখীর সব রহস্য লীনা ভেদ করেনি বটে, কিন্তু আজ এই গ্লাভস কম্পার্টমেন্টটা তাকে টানল। ববি রায় কি একবার বলেছিলেন যে, ওর মধ্যে একটা রিভলভার বা পিস্তল আছে? ঠিক মনে পড়ল না।

একটু নিচু হয়ে প্যানেলের তলাটা দেখল লীনা। নানা রঙের নানারকম সুইচ। গোটা চারেক হাতলের মতো বস্তু। কোনটা টানলে বা টিপলে কোন বিপত্তি ঘটে কে জানে!

লীনা গ্লাভস কম্পার্টমেন্টের তলায় সুইচের মতো একটা জিনিস চেপে ধরল আঙুল দিয়ে। প্রথমটায় কিছুই ঘটল না, তারপর হঠাৎ শ্বাস ফেলার মতো একটা শব্দ হয়ে, আস্তে করে ঢাকনাটা খুলে গেল।

ছোট্ট একটা বাক্সের মতো ফোকর, ভিতরে মৃদু একটা আলো জ্বলছে। লীনা উঁকি দিয়ে দেখল, ভেতরে একটা প্ল্যাস্টিকের ম্যাটের ওপর ঠান্ডা একটা সুন্দর পিস্তল শুয়ে আছে। পাশে একটা প্যাকেটগোছের জিনিস।

লীনা পিস্তল-বন্দুক ভালই চেনে। তার বাবার আছে, মায়ের আছে, দাদার আছে। এক সময়ে লীনা নিজেও শুটিং প্র্যাকটিস করেছে কিছুকাল। হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা সে বের করে আনল।

বেশ ভারী, ৩২ বোরের পিস্তল। ক্লিপের ভিতর দিয়ে গুলির ক্লিপ লোড করতে হয়। দুটো অতিরিক্ত ক্লিপও রয়েছে ভিতরে। প্যাকেটের মধ্যে লীনা সে-দুটোও বের করে এনে দেখল। আর দেখতে গিয়ে পেয়ে গেল একটা চিরকুট। একটা প্যাকেটের মধ্যে সযত্নে ভাজ করে রাখা।

চিরকুটটা সামান্য কাঁপা-হাতে খুলল লীনা। ববি রায়ের হাতের লেখা অতিশয় জঘন্য। পাঠাদ্ধার করাই মুশকিল। ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন সাধারণত এইরকম অবোধ্যভাবে লেখা হয়ে থাকে, যা কম্পাউন্ডার ছাড়া আর কেউ বোঝে না!

লীনা অতিকষ্টে প্রথম বাক্যটা পড়ল, এবং তার গা রি-রি করে উঠল রাগে। লেখা: মিসেস ভট্টাচারিয়া, ইফ ইউ আর নট অ্যান ইডিয়ট অ্যাজ আই হ্যাভ অ্যান্টিসিপেটেড দেন ইউ উইল ফাইন্ড দিস নোট উইদাউট মাচ ট্রাবল।

রাগের চোটে চিরকুটটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল লীনা, তারপর মনে পড়ল, ববি বোধহয় বেঁচে নেই। যদি লোকটা মরেই গিয়ে থাকে তবে খামোখা রাগ করার মানে হয় না।

লীনা চিরকুটটা তার ব্যাগে পুরল। পিস্তল এবং গুলির ক্যাপ আবার যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

অফিসে পৌঁছে লীনা আগে সমস্ত মেসেজগুলো চেক করল। কয়েকটা চিঠিপত্র ফাইল করল। কিছুক্ষণ টাইপ করতে হল। কয়েকটা ফোনের জবাব দিয়ে দিল, তারপর ববির ঘরে ঢুকে দরজা লক করে দিল সে।

চিরকুটটা বের করে আলোর নীচে ধরল সে। অনেকক্ষণ সময় লাগল বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে চিরকুটটার পাঠোদ্ধার করতে পারল। ইংরিজিতে প্রথম বাক্যটার পবে লেখা; আপনি যদি কোডটা পেয়ে থাকেন তবে নীল মঞ্জিলের কথা জেনে গেছেন। যদি না পেয়ে থাকেন তবে ধরে নিতে হবে আমার বরাত খারাপ। আর, আমার বরাত যদি ততদূর ভাল হয়েই থাকে, অর্থাৎ আপনি যদি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই কোডটা আবিষ্কার করে ফেলে থাকেন তবে বাকি কাজটাও দয়া করে করবেন। মনে রাখবেন, অপারেশন নীল মঞ্জিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আরও মনে রাখবেন, মোটেই ইয়ারকি করছি না, আমার মৃত্যুর পর আপনার বিপদ বেড়ে যাবে। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ আমার ওপরেই ওদের

নজর থাকবে বেশি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর... ঈশ্বর আপনার সহায় হোন। আপনার মস্তিষ্ক যথেষ্ট উন্নতমানের নয়, জানি, তবু নীল মঞ্জিলের জন্য আপনাকে বেছে নেওয়া ছাড়া আমার বিকল্প ছিল না। আপনি নির্বোধ বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে যদি আবার ভিতুও হয়ে থাকেন, তবে ববি রায়ের আর কী করার থাকতে পারে? এই নোটটা অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলবেন।

লীনা চিরকুটটা পোড়াল বটে, কিন্তু তার আগে রাগে আক্রোশে সেটাকে ছিঁড়ে কুচিকুচি করল। মস্ত ছাইদানের ভিতর সেগুলোকে রেখে একজন বেয়ারার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে এনে তাতে আগুন দিল। আর বিড়বিড় করে বলল, গো টু হেল! গো টু হেল! আই হেট ইউ! আই হেট ইউ!

কিন্তু রাগ জিনিসটা বহুক্ষণ পুষে রাখা যায় না। তা একসময়ে প্রশমিত হয় এবং অবসাদ আসে।

নিজের চৌখুপি ঘরটায় চুপচাপ বসে থেকে লীনা রাতের অনিদ্রা আর রাগের পরবর্তী অবসাদে ঝুম হয়ে বসে রইল। নীল মঞ্জিলের জন্য ওই হামবাগটা তাকে বেছে নিয়েছে! ইস, কী আস্পা! উনি বললেই লীনাকে সব কিছু করতে হবে নাকি? লীনা কি ওঁর ক্রীতদাসী? সে দশটা-পাঁচটা চাকরি করে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

রোজকার মতোই দোলন এল বিকেল পাঁচটায়, লীনা নেমে এল নীচে। দু'জনে গাড়িতে চেপে বসল।

লীনা, আজও তুমি ভীষণ গম্ভীর।

গম্ভীর থাকার কারণ ঘটেছে, দোলন।

ঘটেছে নয়, ঘটে আছে। তোমার গাম্ভীর্যটা প্রায় পার্মানেন্ট ব্যাপার হয়ে গেছে। আজকাল তোমার কাছে আসতে ভয় করে।

তাই বুঝি! ঠিক আছে, চাকরিটা আগে ছেড়ে দিই তখন দেখবে আমি কেমন হাসিখুশি।

চাকরির জন্যই কি তুমি গম্ভীর? এই যে শুনলাম, তোমার রগচটা বস এখন কলকাতায় নেই!

নেই, কিন্তু না থেকেও আছে। ইন ফ্যাক্ট আমার বস হয়তো এখন ইহলোকেই নেই।

দোলন একটু চমকে উঠে বলল, বলো কী?

খবরটা এখনও অথেনটিক নয়।

উড়ো খবর। তাহলে কী হবে লীনা?

কী করে বলব?

তোমার চাকরিও কি যাবে?

তা কেন? আমি কি ববি রায়ের চাকরি করি? আমি কোম্পানির এমপ্লয়ি। পুরনো বসের জায়গায় নতুন একজন আসবে।

তাহলে তুমি গম্ভীর কেন? ববি রায় তো তোমাকে খুব অপমান করতেন শুনি, সে বিদেয় হয়ে থাকলে তো ভালই।

চুপ করো তো বুদ্ধ! গাড়ি চালাতে চালাতে বেশি কথা বলতে নেই।

তা বটে।

লীনার চোখ জ্বালা করছিল। বুকটা এখনও ভার।

নকল দাড়িগোঁফ যে এত খারাপ জিনিস তা জানা ছিল না ইন্দ্রজিতের। আঠা যত শুকোচ্ছে তত টেনে ধরছে মুখের চামড়া। চুলকোচ্ছেও ভীষণ। তা ছাড়া এইসব দাড়িগোঁফের

মেটিরিয়ালও নিশ্চয়ই ভাল নয়। বিশ্রী বোটকা গন্ধ আসছে। দুর্গাচরণ বলছিল, এইসব দাড়িগোঁফ সংগ্রহ করা হয় মৃতদের দাড়িগোঁফ থেকে। দুর্গাচরণটা মহা ফক্কড়।

গোঁফের একটা চুল নাকে বারবার ঢুকে যাচ্ছে। কয়েকবার হ্যাঁচ্ছো হয়েছে ইন্দ্রজিতের। পাগড়িটা মাথায় এঁটে দিয়ে দুর্গাচরণ বলেছিল, শোন বুদ্ধু, কোনও শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়িতে উঠবি না। তোর ছদ্মবেশটা শিখদের মতো হলেও তুই তো আর ওদের ভাষা জানিস না, বিপদে পড়ে যাবি।

খুবই সময়োচিত উপদেশ, সন্দেহ নেই। কিন্তু কপাল খারাপ হলে আর কী করা যাবে। গোটা পাঁচেক ট্যাক্সি ট্রাই করার পর যেটা তার নির্দেশ মতো যদৃচ্ছ যেতে রাজি হল সেই ড্রাইভারটা শিখ। বেশ বুড়ো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি। সাদা পাগড়ি, চোখে চশমা।

পাঞ্জাবি ভাষায় জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

ইন্দ্রজিৎ ইংরেজিতে বলল, লং টুর। মেনি প্লেসেস।

ড্রাইভার কথাটা ভাল বুঝল না। শুধু বলল, অংরেজি?

এরপর আর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেনি বুড়ো। তবে সারাক্ষণ রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে সন্দেহাকুল চোখে তার দিকে নজর রাখছিল।

লীনার অফিসের সামনে বেলা সাড়ে চারটে থেকে ট্যাক্সি দাড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। সেই ফাঁকে বুড়ো স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিল খানিক। বাঁচোয়া।

ইন্দ্রজিৎ একবার ভাবল, ববি যদি মরেই গিয়ে থাকেন তাহলে আর এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার কী? তারপর ভাবল ববি রায় তাকে এই কাজের জন্য কঁড়িখানেক টাকা দিয়েছেন। গত ছ’ মাস ধরে ওই লোকটার দৌলতেই সে খেয়ে পরে বেঁচে আছে। মরে গিয়ে থাকলেও লোকটার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবাটা তার উচিত হবে না।

পাঁচটার পর লীনা গাড়ি নিয়ে বেরোতেই ইন্দ্রজিৎ বুড়োকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, ফলো দ্যাট কার।

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, কেন?

আঃ ডোন্ট টক।

বুড়ো বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই গাড়ি ছাড়ল। আপনমনেই বকবক করতে লাগল।

ইন্দ্রজিৎ যতটুকু বুঝল, বুড়ো বলছে, অন্য ছোকরার সঙ্গে ছোকরির মহব্বত আছে তো তোমার কী বাপু? দুনিয়াতে কি ছোকরির অভাব? আর ও গাড়িওয়ালি ছোকরি তোমাকে পাত্তা দেবেই বা কেন?

ইন্দ্রজিতের কান লাল হয়ে গেল।

কলকাতা শহরে কোনও গাড়ির পিছু নেওয়া যে কী ঝামেলার কাজ, তা আর বলার নয়। জ্যামে গাড়ি আটকাচ্ছে, ঠেলাগাড়ি, রিকশা উজবুক মানুষ এসে ক্ষণে ক্ষণে গতি ব্যাহত করছে। বুড়োটা তেমন গা করছে না। সব মিলিয়ে একটা কেলো। তদুপরি লীনার গাড়িটা অতিশয় মসৃণ দ্রুতগতির গাড়ি।

তবু শেষ পর্যন্ত লেগে রইল ইন্দ্রজিৎ।

ওরা গঙ্গার ঘাটে নেমে ঘাসের ওপর বসল। ইন্দ্রজিতের ইচ্ছে ছিল, ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার মধ্যে বসে থেকে ওদের ওপর নজর রাখা।

কিন্তু বুড়োটা এ রকম অনিশ্চয় সওয়ারির হাতে আত্মসমর্পণ করতে নারাজ। রীতিমতো খিচিয়ে উঠে বলল, ভাড়া মিটিয়ে দাও, তারপর মোকরির পিছা করো। আমি বাহাত্তুরে বুড়ো এইসব চ্যাংড়ামিব মধ্যে নেই।

অগত্যা ভাড়া মিটিয়ে ইন্দ্রজিৎ গাড়লের মতো নেমে পড়ল।

ববি রায় তার ওপর লীনার রক্ষণাবেক্ষণের ভারই শুধু দেননি, এমন কথাও বলেছেন যে, সে ইচ্ছে করলে লীনার সঙ্গে প্রেম করতে পারে।

মেয়েটা দেখতে আগুন। কিন্তু বাধা হল, ওই ছোকরাটা। নিতান্তই অনুপযুক্ত সঙ্গী। কিন্তু মেয়েরা যখন একবার কাউকে পছন্দ করে বসে তখন তাদের গোঁ হয় সাংঘাতিক।

একটু দূরত্ব রেখে ইন্দ্রজিৎও ঘাসের ওপর বসল। তার পরনে স্যুট। বসতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর ঠান্ডা পড়ায় ঘাসে একটু ভেজা ভাব। অন্ধকার নামছে। কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছে। এই ওয়েদারে গঙ্গার ঘাটে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মতো উন্মত্তরা ছাড়া আর কে বসে থাকবে?

ইন্দ্রজিতের যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে আজ। ভোরবেলা প্লেন ধরতে সেই রাত থাকতে উঠতে হয়েছে। কলকাতায় পৌঁছতে যথেষ্ট বেলা হয়েছে, প্লেন লেট করায়। কুয়াশা ছিল বলে সময়মতো প্লেন নামতে পারেনি। ফলে, এখন ইন্দ্রজিতের একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

লোকটাকে দেখেছ লীনা?

দেখেছি।

কী মতলব বলো তো!

বুঝতে পারছি না। তবে ওর দিকে তাকিয়ো না।

লোকটা কি বিপজ্জনক?

হতে পারে। তুমি বোসো। আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছ লীনা?

গাড়ি থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসছি।

লীনা দ্রুত পায়ে গিয়ে গাড়িতে ঢুকল। তারপর গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট খুলে পিস্তলটা বের করে আনল। আঁচলে ঢাকা দিয়ে পিস্তলটা নিয়ে এসে দোলনের পাশে বসে পড়ে বলল, এবার তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

লোকটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, ও এখানে কী করছে।

তার মানে?

যাও না। ভয় নেই। আমার কাছে পিস্তল আছে।

পিস্তল!– বলে করে রইল দোলন।

ঠিক এই সময়ে একজন লম্বা ভদ্র চেহারার তরুণ কোথা থেকে এসে গেল। লীনার দিকে তাকিয়ে বলল, এনি ট্রাবল ম্যাডাম? আই অ্যাম হিয়ার টু হেলপ ইউ।

১১. পরাজয় স্বীকার

ববি রায় জানেন কখন, ঠিক কখন পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়। ইন্দ্রজিৎকে পালানোর সময় দেওয়ার জন্য যে ডাইভারশনের দরকার ছিল তার চেয়ে অনেকটাই বেশি হয়ে গেল। বস-এর গোড়ালিতে হাতের কানা দিয়ে যে ক্যারাটে চপ বসিয়েছিলেন ববি রায় তাতে যে লোকটার পায়ের হাড় ভেঙে যাবে তা কে জানত!

বস যখন জান্তব একটা চিৎকার করতে করতে সারা ঘর এক পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই সময়ে তার বুন্ধু অ্যাসিস্ট্যান্ট খুবই বশংবদ পায়ে এগিয়ে এল। হয়তো বা বস-এর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ববি রায়কে ছিঁড়ে ফেলবার সদিচ্ছা নিয়েই।

হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও তা চালানো বারণ বলে লোকটা রিভলভারটা উলটে নিয়ে বাঁট দিয়ে মারল মাথায়। লাগলে ববি রায়ের খুলি চৌচির হত। কিন্তু ববি কার্পেটে শোয়া অবস্থাতেই লোকটার হাতে অনায়াসে লাথি চালিয়ে রিভলভারটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

ভারতীয় গুন্ডারা আজ অবধি সত্যিকারের পেশাদার হল না। শুধু মোটা দাগের কাজ ছাড়া তারা কিছুই জানে না। বস-এর এই সহকারীটি আড়েদিঘে ববির দেড়া, গায়ে যথেষ্ট পেশী এবং মোটা হাড়ের সমাবেশ। রীতিমতো ভীতি উৎপাদক চেহারা। ঘুসিটুসি নিশ্চয়ই ভাল চালায়।

ববি পর পর তার তিনটে ঘুসি কাটিয়ে দিলেন শুধুমাত্র মাথাটা এদিক সেদিক চটপট সরিয়ে। যে-কোনও শিক্ষিত মুষ্টিযোদ্ধাই জানে যে, প্রতিপক্ষের ঘুসি কাটাতে হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে, এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ সময়ে, চোখের পলকে। পর পর তিনটে ঘুসি হাওয়ায় ভেসে যাওয়ায় লোকটা এমন বেসামাল ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল যে ববি তাকে উলটে মায়াভরে মাত্র একটি ঘুসি মারলেন। লোকটা পাহাড় ভাঙার

শব্দ করে, মেঝে কঁপিয়ে, চেয়ার টেবিল নিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। আর তখন বস নিজের গোড়ালি চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে অবিশ্বাসের চোখে ববিকে দেখছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চেয়ে ববি রায় বুঝলেন, তিনি জয়ী। তবু নিজের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, এটা যা ঘটল তা অনেকটা যাত্রা-থিয়েটারের মতো ব্যাপার। তার প্রতিপক্ষ ভালই জানে যে সাতঘাটের জল খাওয়া ববি রায়কে মাত্র দুটো গুন্ডা দিয়ে ঢিট করা যাবে না। সুতরাং রি-ইনফোর্সমেন্ট তারা রাখবেই। কিন্তু তারা কোথায় ওত পেতে আছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

ববি বস-এর দিকে চেয়ে ইংরিজিতে বললেন, এ খেলার একটা নিয়ম আছে, বস।

কী নিয়ম?

আমি তোমাকে এই অবস্থায় রেখে যেতে পারি না। তুমি সচেতন অবস্থায় থাকলে টেলিফোনে সাহায্য চাইতে পারো বা আমার পিছনে লোক লাগাতে পারো। এ খেলার নিয়ম হচ্ছে, হয় প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলো, না হয় তো অজ্ঞান করে দাও।

লোকটা অতিশয় কাতর মুখ করে বলল, আমার নড়বার সাধ্যই নেই। গোড়ালি ভেঙে গেছে।

ববি একটা রিভলভার তুলে নিলেন। বললেন, তবু নিয়ম। মাথার পিছনে ছোট্ট একটা চাটি। তারপর তুমি অনেকক্ষণ ঘুমোবে।

নাঃ! প্লিজ।

ববি মৃদু একটু হাসলেন। নিয়ম মানে না এ কেমন খেলোয়াড়?

মাথার খুলিতে মারা একটা আর্ট। অপটিমামের একটু বেশি হলেই কংকাশন। মারতে হয় ওজন করে, খুব মেপে, খুব সাবধানে।

বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে দেখছিল। লক্ষ করছিল ববির সমস্ত নড়াচড়া। মৃদু স্বরে সে হঠাৎ বলল, লাভ নেই মিটার রায়। আমাকে মাবলেও আমাদের জাল কেটে বেরোনো অসম্ভব।

ববি অত্যন্ত সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে বললেন, আমি জানি। শুধু জানি না তোমরা কিসের কোড আমার কাছে চাও।

বস অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে উঠে একটা সোফায় বসল। তারপর বলল, আমেরিকা থেকে তুমি একটা যন্ত্র চুরি করেছিলে।

ববি রায় অবাক হয়ে বললেন, কিসের যন্ত্র?

ক্রাইটন।

ববি মাথা নাড়লেন, খবরটা ভুল।

বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে নিরীক্ষণ করে বলল, খবরটা ভুল ঠিকই। তুমি যন্ত্রটা চুরি করোনি, কিন্তু তার নো-হাউ জেনে নিয়েছিলে।

ববি উদাস গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ক্রাইটনের মতো সফিস্টিকেটেড জিনিস তৈরি করতে কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লাগে জানো? আর কতজন হাইলি-কোয়ালিফায়েড লোক?

বস মাথা নাড়ল, আমি বিজ্ঞানের লোক নই।

জানি। বিজ্ঞানের লোকেরা ওরকম বোকার মতো কথা বলে না।

কিন্তু তোমার কাছে আলট্রাসোনিক ক্রাইটন যে আছে তা আমরা ঠিকই জানি।

ভুল জানো। ভারতবর্ষে এমন কোনও কারখানা নেই যেখানে ক্রাইটন তৈরি করা যায়। আর শোনো বোকা, ক্রাইটনের বিশেষণ হিসেবে কখনও আলট্রাসোনিক কথাটা ব্যবহার করা যায় না।

বস গনগনে চোখে চেয়ে বলল, তুমি কি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ?

মা, তোমার মতো গাড়লেরা কতটা বিজ্ঞান জানে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তোমার প্রভু বা প্রভুরা বোধকরি তোমার মতোই গাড়ল, যদি না তারা আমেরিকান বা ফরাসি হয়ে থাকে।

সেটা যা-ই হোক, আমরা শুধু জানঙে চাই, ক্রাইটনটা কোথায় আছে।

প্রথম কথা, ক্রাইটন নেই। দ্বিতীয় কথা, থাকলেও জেনে তোমাদের লাভ নেই। বাঁদরের কাছে টাইপরাইটার যা, তোমাদের কাছে ক্রাইটনও তাই।

শোনো বায়, তোমার সেক্রেটারি মিস ভট্টাচারিয়া আমাদের নজরবন্দি। চব্বিশ ঘণ্টা তার ওপর নজব রাখা হচ্ছে। আমরা একদিন না একদিন তাকে ক্র্যাক করবই।

ববি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লাথিত গলায় বললেন, তাকে নজরবন্দি করে কী হবে? তোমরা কি ভালো ববি রায় সামান্য বেতনভুক তার এক কর্মচারীর কাছে ক্রাইটনের খবর দেবে? ববি রায় তার সেক্রেটারিদের তত বিশ্বাস করে না।

তবু আমরা তাকে ক্র্যাক করবই, যদি তোমাকে না পারি।

ববি এবার ঘড়ি দেখে বললেন, তোমাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। আর নয়। এবার তোমাকে আমি ঘুম পাড়াব। তারপর আমার কয়েকটা কাজ আছে।

বস এই সময়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। ববি খুব হিসেব-নিকেশ করে তার অপটিমাম শক্তিতে রিভলভারের বঁটটা বসিয়ে দিলেন বস-এর মাথায়। বস যথারীতি কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল মেঝেয়।

ববি দ্রুত পকেট সার্চ করলেন। কোনও কাগজপত্র নেই। তার স্যাঙাতের পকেটও পরিষ্কার। ববি গিয়ে চিকার ঘরের দরজা খুললেন।

ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বাথরুম থেকে জলের শব্দ আসছে।

ববি ঘরটা ভাল করে দেখলেন। কোনও ইন্টিরিয়র ডেকরেটারকে দিয়ে সাজানো হয়েছে। ছবির মতো ঘর। ওয়ার্ডরোবটা খুলে ববি দেখলেন, ভিতরে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটা দামি ড্রেস হ্যাঙারে ঝুলছে। দরজার ওপরে একটা ডার্টবোর্ডে লক্ষ করলেন ববি, মাঝখানের বৃত্তে অন্তত পাচটি ডার্ট বিধে আছে। চিকা যে চমৎকার লক্ষ্যভেদী তাতে সন্দেহ নেই। একটা ওয়াইন ক্যাবিনেটে বিদেশি মদের এলাহি আয়োজন। এমনকী এক বোতল রয়্যাল স্যালুট অবধি রয়েছে।

ববি ওয়াইন ক্যাবিনেটের ঢাকনাটা বন্ধ করলেন। আর ঠিক সেই সময়েই বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল। ববি চোখ বুজে ফেললেন। একেবারে নগ্ন মেয়েমানুষ দেখতে তার অ্যালার্জি আছে।

চিকা গুনগুন করে গান গাইছিল। কী গান তা বুঝলেন না ববি। বোধহয় কোনও উষ্ণ বিদেশি পপ গান।

চিকা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল তখনও সে ঘরের অতিশয় মৃদু আলোয় ববি রায়কে লক্ষ করেনি। সুতরাং ববিকেই জানান দিতে হল।

মৃদু স্বরে ববি বললেন, পুট অন সামথিং মাই ডিয়ার।

চিকা আতঙ্কিত আর্তনাদ করে ঘুরে দাঁড়াল। চোখে দুঃস্বপ্নের অবিশ্বাস। মুখ হাঁ।

ববি ফের ইংরেজিতে বললেন, যা তোক একটা কিছু পরো হে সুন্দরী। আমাদের মেলা কথা আছে। মেলা কাজ।

চিকা চোখের পলকে একটা রোব পরে নিল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এটা কী করে সম্ভব? তোমার তো এতক্ষণে–

ববি মৃদু হেসে বললেন, বলো। থামলে কেন?

বিস্ময়টা আস্তে আস্তে মুছে গেল চিকার চোখ থেকে। একটু মদির হাসল সে। তারপর গাঢ় স্বরে বলল, সুপারম্যান।

ববি রায় দেখছিলেন, মেয়েটি কী দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। তার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল।

চিকা তার বিছানায় বসে অগোছালো চুল দু'হাতে পাট করতে করতে বলল, আমি জানতাম তুমি ওদের হারিয়ে দিলেও দিতে পারো।

ওরা কারা?

চিকা ঠোঁট উলটে বলল, রাফিয়ানস।

তোমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী?

চিকা তার রোবটা খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে ঈষৎ উন্মোচিত করে দিয়ে বলল, কিছু না। এইসব গুন্ডা বদমাশরা মাঝে মাঝে আমাদের কাজে লাগায় মাত্র।

তুমি ওদের চেনো?

চিকা তার বক্ষদেশ এবং পায়ের অনেকখানি অনাবৃত করে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বলল, শুধু একজনকে। বস।

বস আসলে কে?

গ্যাং লিডার। বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল বস শাসন করে। তুমি যদি ওকে মেরে ফেলে থাকো তাহলে তোমার লাশ সমুদ্রে ভাসবে।

আমি অকারণে খুন করি না। ওরা আমার কাছে কী চায়?

আমি জানি না। ওরা একটা কোড-এর কথা বলছিল।

আর কিছু নয়?

চিকা মৃদু হাসল। তারপর বলল, সুপাবম্যান, চিকা কি একেবারেই ফ্যালনা? তোমার কি একটুও ইচ্ছে করছে না চিকার মধ্যে ডুবে যেতে? কিংবা তুমি হোমোসেকসুয়াল নও তো!

না চিকা। আমি হোমোসেকসুয়াল নই। কিন্তু যে লোকটিকে প্রাণের ভয়ে কাটা হয়ে থাকতে হচ্ছে তার কাছে সুন্দরী মেয়ের শরীর অগ্রাধিকার পায় না।

আজ রাতে আমার শরীরের অতিথি হয়ে দেখো, মৃত্যুভয় তুচ্ছ মনে হবে।

চিকা রোবটা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খুলে ফেলল।

ববি চোখ বুজলেন। বললেন, ডোন্ট মেক মি হেট ইউ চিকা। আমি ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখতে পারি না।

চিকা রোবটা আবার গায়ে দিয়ে বলল, বুঝেছি। তুমি চাও পোশাকটা নিজের হাতে খুলতে।

ঠিক তাই।

তাহলে খোলো সুপারম্যান।

বলে চিকা এগিয়ে এল।

বাইরের ঘরে দরজাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে গেল এবং একটি দৈত্যাকার যুবক দরজা জুড়ে দাঁড়াল। চোখে প্রখর দৃষ্টি। মুখখানা লাল টকটকে।

চিকা!

চিকা চোখের পলকে ববি রায়ের কাছ থেকে তিন হাত ছিটকে সরে গেল।

মোট চারজন ঢুকল। একে একে।

নিঃশব্দে।

ববি রায় নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি জানেন, কোন সময়ে তার হার হয়েছে। পরাজয়। এই হচ্ছে পরাজয়।

তবু চারজন সশস্ত্র লোকও ববির যথার্থ প্রতিপক্ষ নয়। ইতিপূর্বে সংখ্যাধিক প্রতিপক্ষের হাত থেকে বহুবার তাকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু ববি লক্ষ করলেন, চিকা তার বিছানার পাশের ছোট্ট বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা বাক্স থেকে একটা ডার্ট তুলে নিল। চিকার হাতটা ওপরে উঠল এবং এত দ্রুত নিক্ষেপ করল জিনিসটা যে হাতখানাকে ক্ষণেকের জন্য মনে হল ওয়াশ-এর ছবি।

ববি দ্রুত ঘুরে গেলেন। কিন্তু তবু এড়ানো গেল না। ডার্ট-এর তীক্ষ্ণ মুখ এসে গভীরভাবে গেঁথে গেল বাঁ কাঁধ আর ঘাড়ের সংযোগস্থলে। ছিটকে গেল রক্তবিন্দু। ববি সামান্য একটা শব্দ করলেন।

তারপরই মাথায় একটা তীব্র আঘাত।

চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। ববি রায় জানেন, কখন পরাজয় স্বীকার করতেই হয়।

ওয়ান টু ওয়ান হলে ইন্দ্রজিৎ ভয় খায় না। সে লড়তে প্রস্তুত। প্রতিপক্ষ যদি একা হয়, তবে সে যত বলশালীই হোক, তার হাত এড়ানো শক্ত নয়। বিশেষ করে পালানোর

প্রতিভা ইন্দ্রজিতের সত্যিই সাংঘাতিক। বলশালী লোকেরা, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করেছে, তেমন জোরে দৌড়তে পারে না।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের বিস্ময় অন্যত্র। সে দিব্যি গঙ্গার ঘাটে বসে নিরাপদ দূরত্ব থেকে লীনা ও দোলনকে নজরে রাখছিল এবং তাদের সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার কথা ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে তার মনে হল লীনা আর দোলন ছোকরা অকারণে তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তারপরই লীনা গিয়ে ফস করে গাড়ি থেকে কী একটা নিয়ে এল। আর তার পরই একটা ঢ্যাঙা পালোয়ানের আবির্ভাব।

কোনও মানে হয় এর? কথা নেই বার্তা নেই ছোকরাটা এসেই ইন্দ্রজিতের দামি কোটের কলারটা ধরে হ্যাঁচকা টানে পঁড় করিয়ে দিল। কবজির কী সাংঘাতিক জোর!

এখানে কী হচ্ছে! অ্যাঁ?

ইন্দ্রজিৎ এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরই দিল। তবে চিঁ চিঁ করে। ইংরিজিতে।

গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি।

খুব জোর একটা নাড়া দিয়ে ছোকরা বলল, হাওয়া খাচ্ছ না আর কিছু!

ডান হাতে পটাং করে একটা চড় কশাল ছোকরা। আর তাতে চোখে লাল নীল তারা দেখতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। ওয়ান টু ওয়ান বটে, কিন্তু তার প্রতিপক্ষ যে একাই এতজন তা আগে জানা ছিল ইন্দ্রজিতের।

ববিকে সে বহুবার অনুরোধ করেছে দু’-একটা প্যাঁচ-পয়জার শেখানোর জন্য। কিন্তু কাজপাগল লোকটা শেখায়নি। ববি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট। দুর্দান্ত বক্সারও ছিল একসময়ে। ছোটখাটো চেহারা বলে মালুম হয় না, কত বড় বড় দৈত্য-দানবকে কাত করতে পারে।

কিন্তু ববির কথা মনে হতেই খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল ইন্দ্রজিৎ। ছোরার হাতে ইঁদুরকলে ধরা অবস্থাতেই সে হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে ছোকরার তলপেটে চালিয়ে দিল।

কাজ হল চমৎকার। ছোকরা তাকে এক মুহূর্তের জন্য আলগা করে দিল।

ইন্দ্রজিৎ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটতে লাগল।

কিন্তু রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা ট্যাক্সি ঘঁস করে এসে একদম সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

ক্যা! ভাগ রহে হো? বেওকুফ!

ইন্দ্রজিৎ দেখল, সেই বুড়ো ট্যাক্সিওয়ালা। স্বজাতি এক শিখ যুবকের এরকম হেনস্তা দেখে বীরের জাত সর্দারজির ক্ষোভ হয়ে থাকবে। সিটের তলা থেকে একটা কৃপাণ বের করে বুড়ো নেমে এল। বয়স সত্তর হলে কী হয়, তেজ যুবকের চেয়ে বেশি।

কিন্তু ততক্ষণে লীনা, দোলন আর যুবকটি গাড়িতে উঠে পড়েছে।

ইন্দ্রজিৎ চট করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

বুড়ো সর্দারজি মুক্ত কৃপাণটি পাশে রেখে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে বলল, পিছা করু?

হাঁ।

সর্দারজি তার নিজস্ব ভাষায় যা বলল, তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, ছুকরির তো বহুত এলেম দেখছি। এক ছুকরির পিছনে তিন-তিনজন বেওকুফ! আরে গবেট, মেয়েমানুষের মধ্যে আছেটা কী? মাংসের ডেলা ছাড়া আর কী পাও তোমরা?

এই দার্শনিক মন্তব্যসমূহে মাথা নেড়ে এবং হু হাঁ করে সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীই-বা করার আছে ইন্দ্রজিতের?

প্রশ্ন হল, ছোকরাটা কে? হঠাৎ তার আবির্ভাব ঘটলই বা কেন?

***

অন্য গাড়িতে লীনা, দোলন আর ছেলেটা পাশাপাশি বসে।

লীনা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

সাদা পোশাকের পুলিশ। আমরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল।

কেন নিয়েছিল তা বলতে পারেন?

না। তবে–

তবে?

না, তেমন কিছু নয়।

আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি ম্যাডাম। পুলিশকে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না ঠিকই, কিন্তু পুলিশ কতটা হেল্পফুল তা তারা জানে না বলেই।

লীনা অমায়িক হেসে বলল, বোধহয় লোকটা আমার প্রেমে পড়েছে।

চৌরঙ্গীতে ছেলেটা নেমে গেল।

১২. একটা সিদ্ধান্ত

লীনা আজ রাত্রে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছিল। প্রথম কথায় নীল মঞ্জিল বলে আর একটা বিপজ্জনক কানামাছি খেলায় সে নামবে কি না। নামলেও তার ভূমিকা কী হবে?

দ্বিতীয় চিন্তা হল, ববি রায় আদৌ মরেছেন কি না। মহেন্দ্র সিং লোকটাই বা আসলে কে? কম্পিউটারের কোড হিসেবে কতগুলো ভুল কথা তাকে কেন শিখিয়ে গিয়েছিলেন ববি? রিভলভারটা সত্যিই তার কাজে লাগবে কি না। গঙ্গার ঘাটে হঠাৎ-আবির্ভূত সেই যুবক সত্যিই কি সাদা পোশাকের পুলিশ?

প্রশ্ন অনেক। কিন্তু একটারও সদুত্তর পাওয়ার কোনও উপায় তার নেই। ববি রায়ের বাড়িতে সে অনেকবার টেলিফোন করেছে। কেউ ধরেনি। অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ববি রায়ের বাড়িতে কেউ থাকে না। তার কোনও পরিবার পরিজন নেই। দু'জন দারোয়ান আছে, তারা ফোন ধরে না, বাড়ি তালাবন্ধ বলে। অফিস থেকে সে আরও জেনেছে, ববি ট্যুরে গেছেন, এর চেয়ে বেশি অফিস আর কিছু জানে না।

বাড়িতে লীনার কোনও আপনজন নেই। দাদা খানিকটা ছিল, এখন দাদাও ভয়ংকর রকমের পর।

তবু দাদাকেও ফোন করেছিল লীনা। তার দাদা দীর্ঘদিন পশ্চিম এশিয়া সফর করে সদ্য ফিরেছে। কিন্তু সন্ধের পর দাদা আর স্বাভাবিক থাকে না। সম্পূর্ণ মাতাল গলায় কথা বলতে শুরু করায় বিরক্ত লীনা ফোনটা রেখে দিল। আজকাল সন্ধের পর সফল পুরুষদের প্রায় কাউকেই স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। এত মদ খেয়ে কী যে হয়।

আজ বিকেলে গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে আসার পর সে আর দোলন কিছুক্ষণ একটা রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা মেরেছে। তখন লীনা নীল মঞ্জিলের কথা তুলেছিল। দোলন অত্যন্ত

গম্ভীর হয়ে বলেছে, তোমার বস যদি মারা গিয়েই থাকেন তবে কেন একটা ডেড ইস্যুকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইছ?

আমার মন কী বলছে জানো? ববি মারা যাননি।

কী করে বুঝলে? সিক্সথ সেন্স?

বলতে পারো।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু নেই।

কিন্তু একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে।

তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু রিস্ক কতটা?

কী করে জানব?

তা হলে ওটা ভুলে যাও লীনা।

তুমি কি ভিতু দোলন?

অবশ্যই। নীল মঞ্জিল হয়তো তোমার বস-এর বাগানবাড়ি। তোমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে...

ছিঃ দোলন। ববি পাগল ঠিকই, কিন্তু ওরকম নন। তোমাকে তো অনেকবার বলেছি, ববি মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকান না। কথায় কথায় অপমানও করেন। লোকটাকে সেইজন্যই আমি এত অপছন্দ করি।

আচ্ছা, আচ্ছা, মানছি তোমার বস খুব সাধু ব্রহ্মচারী মানুষ। কিন্তু তা বলে নীল মঞ্জিল যে খুব নিরাপদ জায়গা এটা মনে করারও কারণ নেই।

লীনা দোলনের কথাটা চুপ করে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তার মনে সেই থেকে একটা অস্বস্তি কাটার মতো বিঁধে আছে। অফিসের বাইরে কোনও কাজ করতেই ববি তাকে বাধ্য করতে পারেন না। কিন্তু লোকটার স্পর্ধিত নির্দেশের মধ্যেও যেন একটা অসহায় আর্তি আছে।

তার মা আর বাবার পার্টি থাকায় আজ একাই ডিনার খেল লীনা। ডিনার সে প্রায় কিছুই খায় না। একটুখানি সুইট কর্ন-সুপ আর আধখানা রুটি। হাসিহীন বৈষ্ণবী খাবারের তদারকি করছিল।

এই নিরানন্দ বাড়ি মাঝে মাঝে লীনার হাঁফ ধরিয়ে দেয়। তার বিপুল স্বাধীনতা আছে, সেকথা ঠিক, কিন্তু এত অনাদর এবং এত ঠান্ডা সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী যন্ত্রণার।

ঘরে এসে স্টিরিয়ো চালিয়ে দিল লীনা। কিছুক্ষণ ঋইঝমাঝম বাজনার সঙ্গে একা একা নাচল ঘরময়।

তবু কেন যে মনটায় এত অস্বস্তি, এত জ্বালা, কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে তার। কী যেন একটা গোলমাল হচ্ছে।

হঠাৎ বৈষ্ণবী এসে দরজার কাছ থেকে ডাকল, দিদিমণি।

লীনা ঈষৎ কঠিন হয়ে বলল, কী বলছ?

তোমার একটা চিঠি এসেছিল আজ। টেলিফোনের টেবিলে রাখা ছিল। দেখলাম তুমি নাওনি। এই নাও।

লীনা চিঠিটা নিল। খামের ওপর অতিশয় জঘন্য হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা। কিন্তু হাতের লেখাটা দেখেই কেঁপে উঠল লীনা। সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ।

বৈষ্ণবী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল লীনা। বোম্বের শীলমোহর অস্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু হস্তাক্ষর কার তা তো লীনা জানে।

বিবশ হাতে খামের মুখটা ছিড়ল সে। একটা ডায়েরির ছেড়া পাতায় সম্বোধনহীন কয়েকটা লাইন। প্রায় অবোধ্য। তবু হাতের লেখাটা খানিকটা চেনা বলে কষ্ট করেও পড়ে ফেলল লীনা।

ইংরেজিতে লেখা : হয়তো এটাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। নীল মঞ্জিলে আপনি আবার সমস্যার মুখোমুখি হকেন। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। তেমন বিপদ বুঝলে লাল বোতামটা টিপে দেবেন। মাত্র তিন মিনিট সময় থাকবে হাতে। মাত্র তিন মিনিট, অন্তত তিনশো মিটার দূরে সরে যেতে হবে ওর মধ্যে। পারবেন?

কোনও মানেই হয় না এই বার্তাটির। কিন্তু কাগজটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লীনার চোখ হঠাৎ জ্বালা করে জল এল।

গভীর রাত অবধি আজকাল তার ঘুম আসে না। কিন্তু হাতের কাছে ঘুমের ওষুধ থাকা সত্ত্বেও সে কখনও তা খায় না।

আজও সে জেগে থেকে শুনতে পেল গাড়ির শব্দ। ফটক খোলার আওয়াজ। তার মা আর বাবা সামান্য বেসামাল অবস্থায় ফিরল। সিঁড়িতে দু'জনে উঠল তর্ক করতে করতে।

তার বাবা রীতিমতো চেঁচিয়ে বলল, সুব্রত ইজ আ নাইস গাই।

তার মা বলল, ওঃ নোঃ! হি ইজ আ স্কাউন্ড্রেল।

লীনা ব্যাপারটা জানে। সুব্রত নামে একটি সফল মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে বাবা আগ্রহী। সুব্রত নিজেও আগ্রহী লীনাকে বিয়ে করতে। বহুবার এ বাড়িতে হানা দিয়েছে লোকটা। খারাপ নয়, কিন্তু এত বেশি ড্রিংক করে যে, তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়াই মুশকিল।

আজ সুব্রতর কথা ভাবতে হাসি পেল লীনার। সুব্রত বড়লোক বাপের ছেলে। হাইলি কানেকটেড। তাদের সঙ্গে একটা কলাবোরেশনের চেষ্টায় আছে লীনার বাবা। বিয়ে হলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু লীনা সুব্রতকে বিয়ে করবে কেন? তার তো কখনও আগ্রহই হয়নি।

লীনা দোলনের কথা ভাবতে লাগল। দোলন একদিন মস্ত বড় মানুষ হবে, এটা লীনার স্থির বিশ্বাস। তার চেয়েও বড় কথা, দোলন হবে তার বশংবদ। ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ তাদের মধ্যে কখনওই হবে না। লীনাকে দোলন এখন থেকেই ভয় পায়।

অস্থির হয়ে লীনা উঠল। তার বাবা আর মায়ের আলাদা আলাদা ঘর নিঝুম হয়ে গেছে। সারা বাড়িটাই এখন ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ।

লীনা বারান্দার রেলিং ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আজও রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি। লীনা চেয়ে রইল, যদি কোনও গাড়িতে আজও সিগারেটের আগুন দেখা যায়!

সিগারেটের আগুন দেখা গেল না বটে, কিন্তু লীনার হঠাৎ মনে হল, একটা ছোট গাড়ির মধ্যে যেন সামান্য নড়াচড়া। কেউ আছে এবং জেগে বসে আছে।

লীনা সামান্য কাঁপা বুক নিয়ে ঘরে চলে এল।

তাকে অকারণে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন ববি। হয়তো ঘটনাগুলি ক্রমে বিপদের আকার ধারণ করবে। কিন্তু লীনা কিছুতেই আজ ববির ওপর রাগ করতে পারল না।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে। এই নিরাপদ নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে সে কি সুখী? এর চেয়ে একটু বিপদের মধ্যে নেমে পড়া যে অনেক বেশি কাম্য।

সে নীল মঞ্জিল রহস্য ভেদ করতে যাবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ল লীনা।

পরদিন অফিসে যথাসময়ে পৌঁছে লীনা অবাক হয়ে দেখল, তার জন্য রিসেপশনে সেই লম্বা চেহারার ছিপছিপে সাদা পোশাকের পুলিশ ছোকরাটি অপেক্ষা করছে।

তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

লীনা বুঝতে না পেরে বলল, কেন বলুন তো?

আমি জানতে এসেছিলাম যে, সেই লোকটা আর আপনার পিছু নিয়েছে কি না। আপনি ইনসিকিওরড ফিল করছেন না তো?

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমার অফিসের ঠিকানা পেলেন কী করে?

ছোকরা মৃদু হেসে বলল, আমি পুলিশে কাজ করি, ভুলে যাচ্ছেন কেন? পুলিশকে সব খবরই রাখতে হয়।

লীনা একটু কঠিন গলায় বলল, একটা সামান্য ঘটনার জন্য আপনার এতটা কষ্ট স্বীকার করারও দরকার ছিল না। পুলিশের কি আর কাজ নেই?

ছোকরা তবু দমল না। হাসিটা দিব্যি মুখে ঝুলিয়ে রেখে বলল, এটাও তো কাজ।

লীনা বলল, ধন্যবাদ। আমাকে কেউ আর ফলো করছে না। নিজের নিরাপত্তা আমি নিজেই দেখতে পারি।

এই বলে লীনা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল লিফটের দিকে। ভ্রু কোঁচকানো, মাথায় দুশ্চিন্তা।

ছোকরাটা এগিয়ে এসে ডাকল, মিস ভট্টাচার্য, একটা কথা।

আবার কী কথা?

কিছু মনে কববেন না, গতকাল আপনার হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেয়েছিলাম।

লীনা সাদা হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না তো।

আপনি জিনিসটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

লীনা নিজেকে সামলে নিতে পারল। বলল, আঁচলের আড়ালে কী ছিল তা বোঝা অত সহজ নয়। আপনি ভুল দেখেছেন।

ছেলেটা খুব অমায়িক গলায় বলল, আমি কোনও অভিযোগ নিয়ে আসিনি। শুধু জানতে এসেছি ওই পিস্তলটার জন্য আপনার লাইসেন্স আছে কি না। ফায়ার আর্মসের ব্যাপারে আমরা একটু বেশি সেনসিটিভ।

আমার কাছে কোনও পিস্তল ছিল না।

ছেলেটা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, মিস ভট্টাচার্য, পিস্তলটা আপনি আঁচলের আড়াল থেকে অত্যন্ত কৌশলে আপনার হাতব্যাগে ভরে ফেলেছিলেন। সেটা হয়তো এখনও আপনার হাতব্যাগেই আছে।

লীনা জানে, আছে। ব্যাগটা কাঁধ থেকে ঝুলছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভারী। ব্যাগটা অবহেলায় একটু দুলিয়ে লীনা মধুর করে হেসে বলল, থাকলে আছে। আপনার আর কিছু বলার না থাকলে এবার আমি আমার ঘরে যাব; আমার দেরি হয়ে গেছে।

ছেলেটা সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, মিস ভট্টাচার্য, আমি যদি আপনি হতাম তা হলে পিস্তলটা পুলিশকে হ্যান্ডওভার করে দিতাম। একটা পিস্তলের জন্য আপনাকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হতে পারে।

লীনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি।

অটোমেটিক লিফটে ঢুকে সুইচ টিপে দিল লীনা। ছোকরার মুখের ওপর দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

ওপরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে লীনা ব্যাগ খুলে পিস্তলটা বের করল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একেবারে নতুন ঝকঝকে পিস্তলটা দেখতেও ভারী সুন্দর। এই বিপজ্জনক জিনিসটা ববি কেন তাকে দিয়ে গেলেন তাও বুঝতে পারছিল না লীনা। এতই কি বিপদ ঘটবে তার?

ববির নামে এক পাহাড় চিঠি এসেছে। সেগুলো খুলে যথাযথ ফাইল করতে লাগল লীনা। ফোন আসতে লাগল একের পর এক। ব্যস্ততার মধ্যে লীনার অনেকটা সময় কেটে গেল।

দুপুরে লাঞ্চ ব্রেক-এর সময় আবার ফোন এল।

হ্যাল্লো।

মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ।

আমি মহেন্দ্র সিং।

কে মহেন্দ্র সিং?

আমি ববি রায়ের সেই বন্ধু যে আপনাকে বোম্বে থেকে ফোন করেছিল। মনে আছে?

লীনা দাঁতে ঠোঁট টিপে ধরল। ববির বন্ধু। তারপর বলল, হ্যাঁ, মনে আছে। মহেন্দ্র সিং আপনার ছদ্মনাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি খুবই বিপন্ন।

তার মানে?

বলছি। কি কথাটা ফোনে বলা যায় না। আপনার সঙ্গে কি একা দেখা করা সম্ভব?

লীনা সতর্ক হয়ে বলল, আপনি কি কোথাও আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাইছেন?

যদি বলি তাই?

তা সম্ভব নয়।

আমি খুব নিরীহ লোক।

আপনি কেমন তা জেনে আমার লাভ নেই। দেখা করতে হলে আপনি আমার অফিসে আসতে পারেন বা বাড়িতে। অন্য কোথাও নয়।

মহেন্দ্র সিং যেন একটু হতাশ হল। স্তিমিত গলায় বলল, তাহলে আপনাকে ফোনেই একটু সাবধান করে দিই। আপনার অফিসে যে ছোকরাটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে খুব সুবিধের লোক নয়।

এ কথায় লীনা অবাক হল। তারপর রেগে গেল। বলল, তার মানে কি আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন

রাগ করবেন না মিস ভট্টাচার্য, আপনার ওপর নজর রাখতে স্বর্গত ববি রায় আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন। অন্তত আরও দিন সাতেক কাজটা আমাকে করতেই হবে। তারপর অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। স্বর্গত ববি রায় তো আর পেমেন্ট করতে পারবেন না, ফলে আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে।

ববি রায় কি সত্যিই মারা গেছেন?

আমি তার লাশ দেখিনি। কিন্তু যাদের খপ্পরে পড়েছেন তাদের হাত থেকে সুপারম্যানদেরও রেহাই নেই।

লীনা কথা বলতে পারল না, আজ তার সত্যিই ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল বুকের মধ্যে। কষ্টটা কিসের তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না সে।

মিস ভট্টাচার্য।

বলুন।

ববি রায় অতিশয় খারাপ লোক।

আপনি তার কেমন বন্ধু?

নামমাত্র।

আমার তো মনে হয় আপনিও খুব খারাপ।

যে আজ্ঞে। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

পারেন।

ওই ছোকরা আপনার কাছে কী চায়?

তা জেনে আপনার কী হবে?

ছোকরাকে একটু জরিপ করা দরকার।

লীনা একটু ভেবে নিয়ে বলল, ছেলেটা বলছে যে ও পুলিশে চাকরি করে।

মোটেই বিশ্বাস করবেন না যেন।

করছি না। আমি তত বোকা নই।

আর কী চায়?

জানি না, তবে মনে হয় আপনার মতো এই ছোকরাও আমার ওপর নজর রাখছে। আমার ওপর। নজর রাখার লোকের অভাব নেই দেখছি।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি একটু সাবধান হবেন।

ধন্যবাদ। আমি যথেষ্ট সাবধানি।

আমি অবশ্য পিছনে আছি।

না থাকলেও ক্ষতি নেই।

লীনা ফোন রেখে দিল।

নীল মঞ্জিলে অভিযান করতে হলে এইসব নজরদারদের এড়ানো ভীষণ দরকার। লীনা ভাবতে বসল।

কাল শনিবার অফিস ছুটি। লীনা কালই নীল মঞ্জিলে যাবে।

১৩. গভীর সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠা

গভীর সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠা অনেকটা গভীর জল থেকে উঠে আসার মতো। অপ্রাকৃত এক ছায়া থেকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থতার ঘোরলাগা আলো। ববি সংজ্ঞাহীনতা থেকে যখন সচেতনতায় ফিরছিলেন তখনও তার ভিতরে আরও একজন কেউ যেন সতর্ক প্রহরায় ছিল। না হলে

সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেও তিনি নিজেকে টের পাচ্ছিলেন কেমন করে?

যে জেগে ছিল সেই কি তার বিকল্প সত্তা, যাকে তিনি বহুবার অনুভব করেছেন তার প্রথাসিদ্ধ জেন মেডিটেশনের সময়? ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাকবেল্ট ববি যখনই তাঁর ইন বা সহনশীলতার অভ্যাস করেছেন, যখনই ইয়ান বা দেহ ও মনের সমগ্র শক্তিকে করতে চেয়েছেন একীভূত, তখনই কি বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি নিজের দেহ থেকে? যে-দেহ আঘাত পায় তার থেকে ভিন্ন হয়ে নির্বিকার থাকার অভ্যাসই তাকে দিয়েছে এক দার্শনিক সদাসঙ্গীকে। সে তাঁরই ওই বিকল্প সত্তা। ইন মানেই নম্রতা, জলের চেয়েও কমনীয় হওয়া, সমস্ত কঠিন আঘাতকে গ্রহণ করা নিজের গভীর সহনশীলতায়। শেষ অবধি কোনও আঘাতই আর আহত করে না। গায়ে ছুঁচ ফোটালেও নিচ্ছিদ্র থেকে যায় ত্বক। বড় অল্প দিনের অল্পায়াস সাধনা তো নয়। ইন আর ইয়ান-এর সেই সমন্বয় বহুদিন ধরে, গভীর অধ্যবসায়ে অধিগত করতে হয়েছে ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাকবেল্টকে।

ববির জ্ঞান ফিরল। টান টান হয়ে উঠল তার চেতনা। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই চেতনার আলো। ববি নিঃঝুম হয়ে পড়ে থেকে তাঁর ইয়ানকে খুঁচিয়ে তুললেন। দেহ ও মন। দেহ আর মনের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করতে লাগলেন একটি জায়গায়, মস্তিষ্কে।

প্রথম প্রশ্ন: তিনি কোথায়?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: তিনি কতটা আহত?

তৃতীয় প্রশ্ন: তার পরিস্থিতি কতটা খারাপ?

চতুর্থ প্রশ্ন: কতদূর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো যায়?

পঞ্চম প্রশ্ন: কতদূর শান্তভাবে তিনি পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেন?

প্রশ্ন আরও আছে। অনেক প্রশ্ন। তবে সেগুলো আপাতত মুলতুবি থাকতে পারে।

তবে এক বছর আগে একদিন নিউ ইয়র্ক থেকে কনকর্ড ফ্লাইটে প্যারিসে ফিরেছেন ববি। জেট ল্যাগ এবং অন্যান্য ক্লান্তি তো ছিলই। প্যারিসে সদ্য নিজের ছোট ও উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টে জানুয়ারির শীতে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে কফি খাচ্ছিলেন। এমন সময় লোকটা এল। দরজা খুলে একজন শীর্ণকায় লম্বা বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ববি অবাক। বাঙালি ভদ্রলোক শীতে কাঁপছিলেন। গায়ে প্রচুর গরম জামা সত্ত্বেও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন শীতে। কথা বলতে পারছিলেন না। এমনকী নিজের পরিচয়টুকু পর্যন্ত না। ববি তাকে ধরে এনে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসিয়ে দিলেন। সামান্য ব্র্যান্ডি মিশিয়ে একপাত্র কফিও।

ভদ্রলোক কফিটুকু সাগ্রহে পান করলেন, পকেট থেকে একটা হোমিয়োপ্যাথির শিশি বের করে কয়েকটা গুলি মুখে ফেলে পরিষ্কার ফরাসি ভাষায় বললেন, আমার নাম রবীশ ঘোষ।

রবীশ ঘোষ নামটা ববি রায়ের স্মৃতিতে কোনও তরঙ্গ তুলল না। এ নাম তিনি শোনেননি।

রবীশ বললেন, আমি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি।

বলুন কী করতে পারি?

রবীশ কোটের পকেট থেকে তার পাসপোর্ট বের করে ববির হাতে দিয়ে বললেন, এছাড়া আমার একটা আইডেনটিটি কার্ডও আছে। যদি চান–

ববি পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়স কত?

একাশিতে পড়েছি।

ববি ঠান্ডা গলায় বললেন, এই বয়সে কেউ মিথ্যে কথা বলে না বড় একটা। আপনাকে অবশ্য যাট-টাটের বেশি মনে হয় না।

রবীশ মাথা নেড়ে বললেন, না, একাশিই। আমি এ দেশে শেষবার এসেছি বছর পনেরো আগে। এখন চব্বিশ পরগনা বা হাওড়ার সামান্য শীতই আমার সহ্য হয় না। প্যারিসের শীত আমার মতো বৃদ্ধের কাছে কতখানি ভয়াবহ তা কল্পনা করুন। তবু আসতে হয়েছে। গত চার দিন প্যারিসে বসে আছি শুধু আপনার জন্যই। চারদিকে বরফ আর বরফ, বেরোতে পারি না।

দরকারটা কি এতটাই জরুরি?

সাংঘাতিক জরুরি।

আপনি ফরাসি ভাষায় কথা বলছেন, এখানে কখনও দীর্ঘদিন ছিলেন?

বহুদিন। একটানা পনেরো বছর।

আমি কিছুটা বাংলা জানি। আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন।

রবীশ তৎক্ষণাৎ বাংলায় বললেন, সেটাই নিরাপদ। আপনি নিশ্চয়ই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাণ্ডকারখানার কথা জানেন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার, টেলিফোন লিংক ইত্যাদি ছাড়াও এরা আর একটা কাজ করে। গোয়েন্দাগিরি।

ববি বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কথা তো আজকাল বাচ্চারাও জানে। স্যাটেলাইটরা গোয়েন্দাগিরির জন্যই আকাশে রয়েছে।

রবীশ হাসলেন, বয়সের দোষ, মায়ের কাছে মাসির গল্প করছি। আপনি জানবেন না তো কে জানবে? কথা হল, আমাদের ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশেরও দু-একটা স্যাটেলাইট আছে। ভূসমলয় স্যাটেলাইট। অর্থাৎ

ববি হাত তুলে বললেন, বুঝতে পারছি। বলুন।

কিন্তু স্পাইং করার যোগ্যতা আমাদের দুর্বল স্যাটেলাইটের নেই। তাই আমি দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছি মার্কিন এবং রুশ উপগ্রহগুলি থেকে ইনফরমেশন সংগ্রহ করার উপায় আবিষ্কার করতে।

ববি কিছুক্ষণ খুব স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে তো চুরি?

রবীশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, চুরি নয়। চোরের ওপর বাটপাড়ি। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের প্রতিটি বর্গফুট জায়গার ছবি এবং খবর রুশ ও মার্কিন উপগ্রহগুলি অবিরাম সংগ্রহ করে যাচ্ছে। এক স্যাটেলাইট থেকে আর এক স্যাটেলাইট রিলে করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের দেশে, যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে মনিটারিং করে চলেছেন দিনরাত। আপনি তো জানেন, ঘাসের নীচে পড়ে থাকা একটি ছুঁচের খবরও এই সব স্যাটেলাইটের কাছে গোপন থাকে না।

সে কথা ঠিক।

আমাদের উপগ্রহের সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমাদেরও কিছু ইনফরমেশন দরকার। নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদেই দরকার। ওরা যখন আমাদের অজান্তেই আমাদের দেশের সব খবর গোপনে সংগ্রহ করে নিতে পারে তখন ওদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তা চুরি হবে কেন? কাজটা খুব শক্ত আমি জানি। ওদের স্যাটেলাইটে এমন লকিং ডিভাইস আছে এবং এমনই ওয়েভ-লেংথে ওরা খবর পাঠায় যা ভেদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের তো অতিকায় এবং সুপারসেনসিটিভ ডিস্ক অ্যান্টেনা নেই। মনিটারিং সিস্টেমও প্রিমিটিভ। দীর্ঘদিন ধরে আমি চেষ্টা করেছি একটা কোনও উপায়

আবিষ্কার করতে। একেবারে ব্যর্থ হয়েছি বলা যায় না। কিন্তু শেষরক্ষা হয়তো হবে না। আমার বয়স একাশি, আমি দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছি। আর তাই আপনার কাছে আসা।

আমার কাছে কেন?

রবীশ বুদ্ধের মতো প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বললেন, আমি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের জগতের খবর সবই রাখি। আপনি এই বয়সে যে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা বিজ্ঞানীদের অজানা নেই। আমি আপনার মোট চারটে পাবলিশড পেপার পড়েছি। পড়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তারও বেশি বিদ্যা আপনার ভিতরে আছে, আমি জানি। ইলেকট্রনিক্স আমারও বিষয়। কলকাতার কাছেই একটা গোপন জায়গায় আমি একটি মনিটরিং সেন্টার তৈরি করেছিলাম। পুরোপুরি ক্যামোফ্লেজড এরিয়া।

আপনাদের সরকার এসব জানেন?

রবীশ মাথা নেড়ে বললেন, আমরা কেউ কেউ ভারত সরকারের একান্ত বিশ্বাসভাজন। সরকার আমাদের কাজের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন না, আমরা সেটা পছন্দ করি না বলেই। কিন্তু আমরা যা টাকা চাই তা বিনা বাক্যব্যয়ে এবং বিনা প্রশ্নে মঞ্জুর করে দেন।

বুঝেছি। তারপর বলুন।

মুশকিল হল, এতকাল আমার দু'জন সহকর্মী ছিল। আমাদের কোনও সিকিউরিটি গার্ড ছিল না। শুধু ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং সিস্টেম রয়েছে। ইচ্ছে করেই আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে লোকের চোখ না আকৃষ্ট হয়। আমরা তিনজন ছাড়া কেউ ছিল না ওখানে। এক-একজন আট ঘণ্টা করে রাউন্ড দি ক্লক কাজ চালু রাখতাম। কেউ অ্যাবসেন্ট হলে অবশ্য কাজ বন্ধ রাখতে হত। একদিন এক সহকর্মীকে কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। মাথায় গুলি, হাতে ধরা নিজের রিভলভার, পরিষ্কার আত্মহত্যা।

অথচ আত্মহত্যা করার কোনও স্পষ্ট কারণ ছিল না। সুখী মানুষ, বউ আর একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে সংসার। তবে তার স্ত্রী বলল, মাঝে মাঝে টেলিফোনে কে যেন শাসাত যে, কথামতো না চললে তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। ওই টেনশন সম্ভবত লোকটা সহ্য করতে পারেনি। তাই নিজে মরে ছেলেকে চিরকালের মতো নিরাপদ করে দিয়ে গেল।

আর আপনার দ্বিতীয় সহকর্মী?

সে তার দেশের বাড়িতে ফিরে গেছে গত মাসে। স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার সন্দেহ, সেও ওরকমই কোনও বিপদে পড়েছিল। তার ছেলেমেয়ে আছে।

আর আপনি?

আমার কেউ নেই। ব্যাচেলর।

আপনাকে কেউ ভয় দেখায়নি?

বৃদ্ধ আবার হাসলেন, সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা। মরতে আমার ভয় নেই। শুধু ভয় আমার মৃত্যুর পর প্রোজেক্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। যাতে আর কারও হাতে না পড়ে তার জন্য প্রোজেক্টটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থাও আমি রেখেছি। কিন্তু সেটা তো চরম ব্যবস্থা।

আপনার প্রস্তাবটা কী?

যদি দয়া করে আমাদের অসম্পূর্ণতা এবং ঘাটতিটুকু আপনি পূরণ করে দেন। হয়তো বছরখানেক লাগবে। তারপর আপনি আবার আপনার স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবেন। আপনার জন্য আমাদের অফার স্কাই হাই নয়। আমাদের দেশ গরিব। আপনি যদিও বিদেশের নাগরিক, তবু ভারতবর্ষ আপনার মাতৃভূমি, আপনি বাঙালিও। আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধটুকু করতে এই বয়সে এতদুর ছুটে এসেছি।

ববি রায় রাজি হননি। বৃদ্ধকে একরকম ফিরিয়েই দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ আবার এলেন। আবার। আর একাশি বছর বয়স্ক তদগতচিত্ত এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের ভিতরে কোনও চালাকি আর ছলচাতুরি নেই বলে ববি রায়ের লোকটার প্রতি সহানুভূতি হতে লাগল।

তারপর একদিন রাজি হলেন। দেখাই যাক অনুন্নত ভারতবর্ষে এই বৃদ্ধ কী এমন কলকবজা তৈরি করেছেন যা উন্নত উপগ্রহের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির লকিং ডিভাইস ববির অজানা নয়। তার ধুরন্ধর মস্তিষ্ক এই সব রহস্যকে জলের মতো পরিষ্কার করে নিতে পারে। কিন্তু মাথা দিয়েই সব হয় না। চাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। চাই নো-হাউ। চাই সহকারী।

রবীশ তাকে অনুরোধ করেছিলেন অন্য কোনও চাকরি বা কাজের ছুতোয় যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন। সেটা কোনও সমস্যাই হল না। কলকাতায় শাখা আছে এমন একটি মাল্টিন্যাশনালে ববি চাকরি নিলেন। ববির মতো তোক চাকরি চাওয়ায় কোম্পানি চমৎকৃত হল, বর্তে গেল। তাকে স্থাপন করা হল কোম্পানির প্রায় মাথায়।

রবীশ তাকে দমদমে রিসিভ করেননি। স্বাভাবিক সতর্কতা, দেখা করেছিলেন সাত দিন পর। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, একটা বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেনের দুনম্বর কোচে। দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আরও সাত দিন পর, বালি-দুর্গাপুরের এক বাড়িতে। তারপর একদিন নানা ঘোরালো পথে, নানা আঘাটা ঘুরে, সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের চোখে ধূলো দেওয়ার নানা বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে, রবীশ তাকে নিয়ে হাজির করলেন নীল মঞ্জিলে।

বিশাল বাগান ঘেরা একটা নিঃঝুম বাড়ি। ধারে কাছে লোকালয় নামমাত্র। বাগানের মধ্যে গাছের চেয়ে আগাছাই বেশি। চারদিকে উঁচু দেওয়ালে ইলেকট্রিক ফেনসিং। ফটকে অটো লক। গাছপালা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎবাহী সরু তার পেতে রখা। আছে বিচিত্র

অ্যালার্ম এবং মিনি-মাইন। আছে বুবি ট্র্যাপ। কয়েকবার হয়তো চেষ্টা করেছিল চোর ডাকাতেরা, বিচিত্র কাণ্ড কারখানা দেখে ভয় খেয়ে আর কেউ এ মুখো হয় না।

এ সবই রবীশের কাছে শুনল ববি রায়।

নীল মঞ্জিল এক পুরনো বাড়ি। সম্ভবত কোনও ধনবান ব্যক্তির বাগানবাড়ি ছিল। ছাদে নানা রকমের অ্যান্টেনা। ভূগর্ভের ঘরে মনিটরিং সেন্টার।

ববি সবই দেখলেন। অতিশয় মনোযোগ দিয়ে। খুব খুশি হলেন, এমন বলা যায় না। তবে এই বৃদ্ধ যে এতকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

মিস্টার ঘোষ, আমি অতিমানব নই, আমার অতিমস্তিষ্কও নেই। তবে আপনার কাজ দেখে মনে ইচ্ছে আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এমন হতেও পারে, কিছুদিন চিন্তাভাবনা করলে আমি আপনার এইসব ডিভাইসকে খানিকটা ইমপ্রুভও করতে পারি। বিদেশি উপগ্রহকে পেনিট্রেট করা হয়তোবা সম্ভবও হবে। কিন্তু আপনি কীরকম ইনফরমেশন চান?

সবরকম। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা চাই তা হল, কার অস্ত্রভাণ্ডারে কত রকম অস্ত্র জমা হচ্ছে। বিশেষ করে পরমাণু বোমা।

ববি হেসেছিলেন, জেনে কী হবে?

রবীশ তাঁর সেই অসামান্য হাসিটি হেসে বললেন, ববি, আমি আপনার সম্পর্কে অনেক জানি।

কী জানেন?

আমি জানি আপনি ক্রাইটন নো-হাউ জানেন। ক্রাইটন এমনই ডিভাইস যা যে-কোনও পরমাণু ওয়ারহেডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে। যদি এ দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও

পরমাণু বোমা কোথাও উদ্যত হয়ে থাকে তবে ক্রাইটন তা বিস্ফোরিত করে দিতে পারে তার বেস- এ।

পারে, কিন্তু তার জন্য একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে।

জানি। আমরা আমাদের পরবর্তী স্যাটেলাইটে ক্রাইটন যোগ করে দেব। আমাদের উদ্দেশ্য ও কাজের লক্ষ্য পরিষ্কার। যদি আমরা স্যাটেলাইটগুলো থেকে এমন কোনও ইঙ্গিত পাই যে, আমাদের দেশ আক্রান্ত হতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের উপগ্রহকে নির্দেশ দেব স্থির লক্ষ্যে ক্রাইটনকে তার তরঙ্গ বিস্তার করতে।

ববি একটা বড় শ্বাস ফেললেন। রবীশ অনেকটাই ভেবেছেন, বৃদ্ধ বৃথা জীবন কাটাননি।

কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে। গত কয়েক মাস ববিকে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে নীল মঞ্জিলে। প্রতিবারই বিচিত্র ঘুরপথে, কখনও ছদ্মবেশেও।

একদিন আচমকা ববি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এত সতর্কতার কারণ কী? সিকিউরিটি? আপনার মাদ্রাজের সহকর্মী হয়তো এতদিনে পাকে পড়ে মুখ খুলে ফেলেছে।

রবীশ খুব বিষণ্ণ মুখে অধোবদন হলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন, না, মুখ খুলবার উপায় তার নেই।

তার মানে?

হি ডায়েড এ ন্যাচারাল ডেথ। অবশ্য অ্যারেঞ্জড ন্যাচারাল ডেথ।

ববি মাথা নাড়লেন। বললেন, গুড, দ্যাটস গুড।

এ কেয়ার্ড ম্যান ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস।

মাত্র গত সপ্তাহে এক সকালে রবীশের ফোন আসবার কথা ছিল, এল না, ববি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই ফোন করলেন।

একটা ভারী গলা জবাব দিল, কাকে চাই?

রবীশ ঘোষ।

আপনি কে?

ওঁর এক বন্ধু।

রবীশ ঘোষ মারা গেছেন।

কীভাবে?

এ কেস অফ মার্ডার। আপনার–

পরিচয় ববি ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

রবীশ! সৌম্য, কর্মপ্রাণ রবীশ। ববির ভাবাবেগহীন মনেও চমকে উঠল একটা গভীর শোকাহত ভালবাসা।

আপাততত ববি একটা কাঠের পাটাতনে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর প্রতিটি হাত ও পা আলাদা আলাদা ভাবে অতিশয় শক্ত দড়ি দিয়ে চারটে গজালের সঙ্গে বাঁধা। নড়ার উপায় পর্যন্ত নেই।

এরা জানে কীরকম নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয়।

ববি শরীরকে নরম করে রাখলেন। হাত-পায়ে এতটুকু টান দিলেন না। সামান্য শক্তিক্ষয়ও নিরর্থক। শরীর তার বশীভূত। মন তার বশীভূত। শরীর ও মনের সেই সমন্বয় এক অলৌকিক ইন ও ইয়ানকে জাগ্রত করে দেয়।

ববি চুপ করে পড়ে রইলেন। একটা চৌকো ঘর, অন্ধকার। বাইরে অবশ্যই প্রহরী রয়েছে। ববির জন্য এরা বিস্তারিত আয়োজন করে রেখেছে।

ববি আস্তে আস্তে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। মন, একীভূত হও, শরীর বশীভূত হও। জাগো জেন।

১৪. বিকেলের ম্লান আলোয়

বিকেলের ম্লান আলোয় রবীশের মৃত্যুনীল মুখ দেখেছিলেন ববি। একাশি বছরের তদগত বৃদ্ধকে মৃত্যুতেও প্রশান্ত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল। যখন তাকে গুলি করা হয় তখন বোধহয় নিজের জানালার ধারের আরামকেদারায় বসে রবীশ আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। আততায়ীরা যখন ঘরে ঢোকে তখনও রবীশ বোধহয় পালানোর চেষ্টা করেননি। জানতেন পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন তা শান্তচিত্তে গ্রহণ করাই ভাল। তবে রবীশ যে প্রতিরোধ করেননি তা নয়। আরামকেদারার ধারে তার ঝুলে পড়া হাত থেকে একটা ছোট রিভলভার খসে পড়েছিল মেঝেয়। বিপদের মধ্যে কাল কাটাতে হত বলেই বোধহয় অস্ত্রটা সব সময়ে সঙ্গে রাখতেন কিন্তু ব্যবহার করার অবকাশ পাননি।

এ সবই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন ববি। আর পুলিশ তাঁকে অজস্র জেরা করে যাচ্ছিল তিনি কে, রবীশের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ইত্যাদি। পুলিশ যে ঝামেলা করবে তা তিনি জানতেন, তবু রবীশের মৃতদেহটি একবার স্বচক্ষে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারেননি।

দিন দুই বাদে আর একবার গেলেন ববি। একটু রাতের দিকে। রবীশের ঘরের তালা একটা স্কেলিটন কী দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, তাঁর জন্য রবীশ কোনও বার্তা রেখে গেছেন কি না। অবশেষে পাওয়া গেল। ছোট্ট একটা পকেট-টেপরেকর্ডারে ক্যাসেটটা লোড করা ছিল। প্রথমে দু’ মিনিট একটা কনসার্ট বাজল। তারপর রবীশের গলা পাওয়া গেল। ফরাসি ভাষায় বললেন, ববি, আপনাকে ওরা আবিষ্কার করবেই। সাবধান।

রবীশের মৃত্যুর পরই ববি বুঝলেন, তিনি ভারমুক্ত। নীল মঞ্জিলের বাকি কাজ করার দায় তার নয়। তিনি এবার এ ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন। বিদেশে অনেক

বড় প্রোজেক্ট তার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি জানতেন, চব্বিশ ঘন্টা তার ওপর কেউ নজর রাখছে। তাই তিনি লীনাকে…।

ববি এখন স্থির হয়ে পড়ে আছেন কাঠের পাটাতনে। যন্ত্রণার এখন কোনও স্থিরবিন্দু নেই। ববি সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত শরীরে। অপেক্ষা করছেন। কাঠের উদোম পাটাতনটা যথেষ্ট কর্কশ। ববির প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু অসম্ভব সহনশক্তি দিয়ে নিজেকে স্থির রাখছেন ববি। কবজি ও পা ইলেকট্রিকের তার দিয়ে বাঁধা। একটু নড়লেই তার বসে যাবে মাংসের গভীরে।

একটা দরজা খোলার শব্দ হল কি? ঘরে সামান্য আলো ছড়িয়ে পড়ল। ববি দেখলেন একটা মস্ত বড় গুদাম ঘরের মতো ঘর। একধারে চটে মোড়া অনেক প্যাকিং বাক্স।

একটা লোক এগিয়ে এল কাছে।

ববি চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন।

লোকটা নিচু হয়ে তাঁকে একটু দেখল। চোখের পাতা ধরে টেনে পরীক্ষা করল চোখের মণি। তারপর স্মেলিং সেন্ট-এর একটা শিশি ধরল নাকের সামনে।

ববি একটু শিউরে উঠে চোখ মেললেন।

সামনে দৈত্যাকার সেই যুবক। ভারতীয়দের গড়পড়তা চেহারা এরকম সাধারণত হয় না। ছেলেটা সম্ভবত বাস্কেটবল বা ওই জাতীয় কিছু খেলত। চমৎকার আঁট শরীরের বাঁধুনি।

ববি চোখ চাইতেই ছেলেটা বলল, সরি।

সরি?

ছেলেটা ইংরেজিতে বলল, তুমি বিখ্যাত লোক। তবু নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে এনেছ!

তোমরা আমার কাছে কী চাও?

একটা ঠিকানা। আর একটা কোড।

কেন চাও?

আমরা প্রোজেক্টটা ধ্বংস করে দেব।

কেন করবে?

ববি, আপনার এতে স্বার্থ কী? আপনি কেন এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন নিজেকে? আপনি বলে দিন, আমরা আপনাকে সসম্মানে প্লেনে তুলে দেব। আপনি প্যারিসে চলে যাবেন।

ববি সামান্য একটু ভ্রু তুলে বললেন, এতই সহজ?

আপনার ক্ষতি করে আমাদের লাভ কী?

ববি গম্ভীরভাবে বললেন, প্রোজেক্টটা ধ্বংস করলেও যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আবার তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সুতরাং আমাকে ছেড়ে দেওয়া তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

ছেলেটা একটু চিন্তিতভাবে ববির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ববি, আপনার সেক্রেটারি লীনা ভট্টাচারিয়া আমাদের নজরে রয়েছেন। আজ হোক, কাল হোক, তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমাদের পক্ষে প্রোজেক্টটা নষ্ট করে দেওয়া শক্ত হবে না।

ববি সামান্য ক্লান্ত স্বরে বললেন, তোমরা শুধু প্রোজেক্টটা ধ্বংস করতে চাইলে এত কষ্ট স্বীকার করতে না। তোমরা ওর সিক্রেটটাও চাও।

যুবকটির মুখে কখনও হাসি দেখা যায় না। সর্বদাই যেন চিন্তান্বিত। মাথা নেড়ে বলল, আমি কোনও সিক্রেটের কথা জানি না।

তুমি ক্রীড়নক মাত্র। যারা জানবার তারা ঠিকই জানে।

যুবকটি ধীর স্বরে বলল, ববি রায়, প্রাণ বাঁচানোর একটা শেষ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করছ। আমার পর যারা তোমাকে অনুরোধ করতে আসবে তারা ইতর লোক, প্রায় পশু।

ববি মৃদু স্বরে বলল, ওদের আসতে দাও।

যেমন তোমার ইচ্ছা।

যুবকটি চলে গেল।

ববি উপুড় হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে শোয়া অবস্থায় বুঝতে পারছিলেন, এই রকম ল্যাবরেটরির মরা ব্যাঙের মতো পড়ে থেকে কিছুই করা সম্ভব নয়। অন্তত একটা হাতও যদি মুক্ত করা যেত।

দরজা দিয়ে দু'জন ঢুকেছে। এগিয়ে আসছে।

ববি চোখ বুজলেন! ইন আর ইয়ান। ইন আর ইয়ান। শরীর ও মন বশীভূত হও। এক হও। এ দেহ সমস্ত আঘাত সহ্য করতে পারে। জল যেমন পারে। বাতাস যেমন পারে।

ববি এক বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে ধ্যানস্থ হলেন।

চেতনার একটা মৃদু আলো শুধু জ্বলে রইল তার ভিতরে।

রবারের হোস-এর ছোট্ট টুকরো দিয়ে ওরা মারছে। চটাস চটাস শব্দ হচ্ছে পিঠে, পায়ে, সর্বাঙ্গে। যেখানে লাগছে সেখানেই যেন আগুনের হলকা স্পর্শ করে যাচ্ছে।

জাগ্রত হও, জেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে ঝড় বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে।

দুটো লোক থামল।

ববি চোখ মেললেন, হয়ে গেল?

লোকদুটো অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল ববির দিকে। তাদের অভিজ্ঞতায়, এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। সাধারণত এরকম মারের পর লোকে গ্যাঁজলা তুলে অজ্ঞান হয়ে যায়।

বিস্ময় ক্ষণস্থায়ী হল। দুটো মজবুত চেহারার নৃশংস প্রকৃতির লোক কেসের থেকে খুলে আনল নিরেট রবারের ভারী মুগুর। যাকে ইংরেজিতে 'কশ' বলে।

এবার ববি নিজের শরীরের ঢাকের বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন। দুম দুম।

কতক্ষণ সংজ্ঞা ছিল না কে বলবে? যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন ববি টের পেলেন, তার হাত ও পায়ের বাঁধন খোলা। তবে এখনও তিনি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন কাঠের তক্তার ওপর।

শরীরটা যেন আর তার নয়। এত অবশ, অসাড়, দুর্বল লাগছিল নিজেকে যে, চোখের পাতাটুকু খোলা পর্যন্ত কঠিন কাজ মনে হচ্ছে। কিন্তু এরা ভুল করছে। ববিকে ওরা চেনে না। শরীরই যে সব মানুষের শেষ নয়, শরীরকে ছিন্নভিন্ন করলেও যে কোনও কোনও মানুষকে ভেঙে ফেলা যায় না, সেই জ্ঞান এদের নেই।

ববি কোনও বোকামি করলেন না। হঠাৎ উঠে বসলেন না বা হাত-পা ছুড়লেন না যন্ত্রণায়। তিনি শুধু উপুড় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ব্যথা বুঝে কাত হয়ে শুলেন। হাত পা ও সমস্ত শরীরকে যতদূর সম্ভব শান্তভাবে ফেলে রাখলেন। যতদূর মনে হচ্ছে কোনও হাড় ভাঙেনি। ভাঙলে বমির ভাব হত, চোখে কুয়াশা দেখতেন। তবে শরীরের ওপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে গেছে সেটাও হাড় ভাঙার চেয়ে কম নয়।

চমৎকার কাজ করছে তাঁর মাথা। ববি নিজেকে বিশ্রাম দিয়ে শুধু মাথাটাকে চালনা করলেন। বৃদ্ধ রবীশ ও তার দুই সহকর্মী যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করেও সবটা পারেননি। রবীশ বৃদ্ধ হলেও কঠিন ঝুনো মানুষ। নীল মঞ্জিল তারই মস্তিষ্কের ফসল। তার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেললেও কোনও তথ্য বের করা সম্ভব ছিল না। তার অন্য দুই সহকর্মীকে ববি চেনেন না। সম্ভবত তাদের কেউ কোথাও অসাবধানে মুখ খুলেছিলেন।

নীল মঞ্জিলের ঠিকানা এখনও প্রতিপক্ষ জানে না জেনেও বিশেষ লাভ নেই। সেখানকার সুপার কম্পিউটার বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বেড়াজাল ভেদ করে প্রকৃত তথ্য জানা খুবই কঠিন, তবু যদি কোনও বিশেষজ্ঞকে ওরা কাজে লাগায় তবে একদিন হয়তোবা নীল মঞ্জিলের রহস্য ভেদ করা অসম্ভব না-ও হতে পারে। আজ অবধি কেউ বৃহৎ শক্তির অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের গর্ভ থেকে তথ্য চুরি করতে পারেনি। রবীশ সেই কাজে বহুদূর এগিয়েছেন। তাঁকে আরও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন ববি। এর মধ্যে ববিকে বহুবার বিদেশে যেতে হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গোপনে আমদানি করতে। এ কাজে ববি খুবই অভ্যস্ত। কখনও নিজে, কখনও আন্তর্জাতিক চোরাই চালানদারদের মাধ্যমে জিনিস এসেছে। কিছু বেসরকারি শিপিং কোম্পানি টাকার বিনিময়ে ববিকে সাহায্য করেছে। প্রত্যেকটা পর্যায়ে কাজ বার বার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে নথিবদ্ধ করার পর তা সাইফারে লিপিবদ্ধ করেছেন রবীশ। কম্পিউটারে জটিল কোডের আবছায়ায় নির্বাসিত করেছেন তাদের। সবটা ববিও জানেন না।

কিন্তু জানতে হবে। রবীশের মৃত্যু-ম্লান মুখচ্ছবি ববির চোখের সামনে আজও অম্লান ভেসে ওঠে। একাশি বছর বয়সেও মানুষ কতখানি সঞ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ! কতখানি শক্ত! বিকেলের ছাইরঙা আলোয় রবীশের উপবিষ্ট মৃতদেহ তার নিজের জয়ই ঘোষণা করছিল ভারী বিনয়ের সঙ্গে।

ববি খুব ধীরে ধীরে মাথাটা তুললেন। তারপর ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন। লক্ষ করলেন, এই পাষণ্ডেরা তাঁকে এখনও পুরোপুরি মারতে চায়

না বলেই বোধ হয় একটা নাঙ্গা টেবিলের ওপর এক জগ জল আর একটি ঢাকা থালি রেখে গেছে।

রবি প্রথমে কাঁপা দুর্বল হাতে জগটা তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন।

পিঠ আর পায়ের চামড়া ফেটে চিরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ফুলে আছে ক্ষতবিক্ষত শরীর। তবু ববি টের পেলেন, তার খিদে পেয়েছে। প্রচণ্ড খিদে। সম্ভবত গত ষোলো-সতেরো ঘন্টা তিনি কিছুই খাননি।

খুবই দুর্বল হাতে খাবারের ঢাকনাটা খুললেন ববি। কোনও হোটেল থেকে আনা তৃতীয় শ্রেণির থালি। দু'মুঠো ভাত, দু'খানা রুটি, দু'-তিনটে সবজি আর সামান্য দই।

ববি খুব ধীরে ধীরে খেলেন।

তারপর উঠে দুর্বল পায়ে সামান্য কয়েক পা হাঁটলেন। বুঝলেন, চোট সাংঘাতিক। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন বিদ্যুৎ-শিখার মতো তীব্র যন্ত্রণা লক লক করে উঠছে।

ববি বসে হাঁফাতে লাগলেন। জল আর খাবারের ক্রিয়া আরও কিছুক্ষণ চললে হয়তো সবল বোধ করবেন।

কাঠের পাটাতনটার ওপর ফের শুয়ে পড়লেন। এবার সংজ্ঞাহীনতা নয়, প্রগাঢ় ঘুমে চোখ আঠা হয়ে লেগে এল।

ঘুম ভাঙল সামান্য একটা শব্দে। সম্ভবত রাত গভীর হয়েছে। গুদামের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার।

ববি উঠে বসলেন। পায়ের দিকে দরজাটা কি খুলে যাচ্ছে? কেউ ঢুকছে?

ববি তাঁর কর্তব্য স্থির করে নিলেন চোখের পলকে। এরা যদি তাকে আবার বাঁধে মুশকিল হবে। তিনি অন্ধকারেই তক্তা থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে আন্দাজে এগোতে লাগলেন।

দরজাটা বেশ বড়। দুটো বিশাল কাঠের পাল্লা। একটা পাল্লা ফাঁক করে একজন লোক একটা লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল। বিশাল গুদামঘরের অবশ্য সামান্যই আলোকিত হল তাতে। লোকটার অন্য হাতে একটা লোহার পাঞ্চ। ববি বেয়াদপি করলে পাঞ্চ চালাবে।

ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে এল লোকটা তক্তার দিকে। তারপর জায়গাটা শূন্য দেখে থমকাল। চকিতে ঘুরে লণ্ঠনের আলোয় ববিকে খুঁজবার চেষ্টা করল।

তারপর কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা প্রবল আঘাতে লণ্ঠনসমেত চার হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেল।

ববির পা অত্যন্ত দুর্বল, ব্যথাতুর। তাতে একরকম ভালই হয়েছে। যে কারাটে কিকটা ববি মেরেছেন লোকটার মাথায় সেটা সবল পায়ে মারলে লোকটার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারত।

ববি হাতড়ে হাতড়ে লোকটার কাছে গেলেন। তাঁর নিজের পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছু নেই। এই অবস্থায় বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক। ববি নিপুণ হাতে লোকটার গা থেকে ট্রাউজার্স আর হাওয়াই শার্ট খুলে নিলেন। পা থেকে চটিও। ববির গায়ে একটু ঢোলা হবে কিন্তু আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।

ট্রাউজারের পকেটে কিছু টাকা আছে। আর আছে একটা দেশলাই।

হাই মেহদি! হোয়াটস দ্য ম্যাটার?

দরজাটা খুলে সেই দৈত্যাকার যুবকটি এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা তীব্র আলোর টর্চবাতি। আলোটা সোজা এসে পড়েছে মেঝেতে শয়ান লোকটার ওপর।

দরজার পাল্লার আড়াল থেকে ববি হাতটা তুললেন।

মাত্র একবারই চপ করে একটা শব্দ হল। বিশাল দৈত্য কুঠার-ছিন্ন মস্ত গাছের মতো ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর।

ববি টর্চটা কুড়িয়ে নিলেন। কাজে লাগবে।

দৈত্যের পকেট থেকে ববি রায় এক বান্ডিল নোট পেয়ে গেলেন। বেশ কয়েক হাজার টাকা। আর দুটো জিনিসও পেলেন। গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আর গাড়ির চাবি।

বাইরে বেরিয়ে ববি চারদিকটা সতর্ক চোখে দেখলেন। জায়গাটা একটা মস্ত গো-ডাউন এলাকা। শুনশান নির্জন। রাস্তাঘাট নোংরা। প্রচুর লরি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিয়াট গাড়িটা সামনেই দাঁড় করানো। দরজায় লক নেই। ববি উঠলেন। স্টার্ট দেওয়ার আগে জায়গাটা আঁচ করার চেষ্টা করলেন একটু। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

অন্তত মাইলখানেক দুরে আসবার পর ববি চওড়া রাস্তা পেয়ে গেলেন। যথেষ্ট চনমনে বোধ করছেন ববি। তবে সর্বাঙ্গের যন্ত্রণা ও বিষিয়ে ওঠা ক্ষতস্থান তো সহজে ভুলবার নয়।

ববি যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন আরও মাইল তিনেক যাওয়ার পর। একটা নার্সিং হোম।

গাড়ি নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

রিসেপশনে যে ঘটনাটা বানিয়ে বললেন ববি, তা চমৎকার। তিনি জুয়ার আড্ডায় গুন্ডাদের পাল্লায় পড়েছিলেন। প্রচণ্ড মার খেয়েছেন। প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছেন। চিকিৎসা দরকার।

রিসেপশনের ক্লার্কটি সখেদে বলল, নো বেড স্যার।

ববি অত্যন্ত অবহেলায় ভাঁজ করা দুটো একশো টাকার নো্েট কাউন্টারে রাখলেন, ইয়োরস। আই নিড ট্রিটমেন্ট, রেস্ট, স্লিপ... প্লিজ...।

লোকটা নরম হল।

আধঘণ্টার মধ্যেই চমৎকার ছোট্ট একটা কেবিন পেয়ে গেলেন ববি। একজন নার্স এসে তাঁর ক্ষতস্থানে ওষুধ দিল। ইনজেকশন করল। এক কাপ কড়া কফিও চাইলেন ববি। পেয়ে গেলেন। তারপর ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়লেন অক্লেশে!

খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল ববির। আরও অনেকক্ষণ তার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, তিনি জানেন। দরকার ওষুধ এবং পথ্যেরও। কিন্তু অত সময় তার হাতে নেই।

খুব ভোরবেলা লীনার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। আসলে ঘুম নয়। চটকা। লীনার ঘুম হচ্ছে না আজকাল। বার বাব দুঃস্বপ্ন দেখে, আর ঘুম ভেঙে যায়।

হ্যালো।

বহুদূর থেকে একটা ফ্যাসফ্যাসে ভুতুড়ে গলা বলল, আই ওয়ান্ট মিসেস ভট্টাচারিয়া।

লীনা ইংরেজিতে বলল, আমাব মা এখন ঘুমোচ্ছন। আপনি কে বলুন তো?

আমি লীনা ভট্টাচারিয়াকেই চাইছি।

আমিই লীনা।

মিসেস ভট্টাচারিয়া! আর ইউ ইন ওয়ান পিস? থ্যাংক গড!

হঠাৎ সর্বাঙ্গ এমন কাঁটা দিয়ে উঠল লীনার। এ কি মৃত্যুর পরপার থেকে আসা টেলিফোন? এও কি সম্ভব?

গলায় কী যে আটকাল লীনার, কিছুতেই কথা বলতে পারছিল না। শুধু একটা অস্ফুট ফোঁপানি তার গলা থেকে আপনিই বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মিসেস ভট্টাচারিয়া, আমি… আমি একটু উন্ডেড। খুব বেশি নয়। কিন্তু একটু সময় লাগবে রিকভার করতে। অ্যাট লিস্ট আরও চব্বিশ ঘণ্টা। আই অ্যাম ইন এ ব্যাড শেপ।

আর ইউ অ্যালাইভ? রিয়েলি তালাইভ?

ভেরি মাচ।

১৫. গলায় আনন্দের কাঁপন

লীনা কিছুতেই, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, তার গলায় আনন্দের কাঁপনটিকে থামাতে পারল না। গাঢ় শ্বাস ফেলে বলল, কী হয়েছিল আপনার? কোনও অ্যাক্সিডেন্ট?

না, মিসেস ভট্টাচারিয়া। এ সিম্পল কেস অফ প্রহার।

কারা আপনাকে মারল, আর কেন?

পয়সা পেলে তারা সবাইকেই মারে। প্রফেশনাল ঠ্যাঙাড়ে। মারাঠি ভাষায় যাদের বলা হয় দাদা। দাদা মানে জানেন?

জানি, দাদা মানে গুন্ডা।

কলকাতাতেও দাদা আছে মিসেস ভট্টাচারিয়া। আপনি কোনও রিমোট জায়গায় কিছুদিনের জন্য পালিয়ে যান।

কেন, বলুন তো! পালানোর মতো কী হয়েছে?

ইউ আর ইন ডেঞ্জার, চাইল্ড।

ড্রপ দি চাইল্ড বিট। আমি কাউকে ভয় পাই না।

বোকা-সাহস দিয়ে কিছু হয় না মিসেস ভট্টাচারিয়া। ট্যাক্টফুল হতে হয়।

আপনি আমাকে বোকা ভেবে কি স্যাডিস্ট আনন্দ পান? জেনে রাখুন, আপনি আমার চেয়ে বেশি চালাক নন।

ববির দীর্ঘশ্বাস টেলিফোনে ভেসে এল। আরও স্তিমিত গলায় ববি বললেন, চালাকিতে আমি বরং আপনার চেয়ে কিছু খাটোই হব। কিন্তু আমার অ্যানিম্যাল ইন্সটিংক্ট খুব প্রবল। তাই মরতে মরতে আমি বার বার বেঁচে যাই। আপনার ওই ইটিংক্টটা নেই।

থাকার কথাও নয় মিস্টার বস।

আপনাদের অনেক কিছু নেই মিসেস ভট্টাচারিয়া। তাই আপনি অত্যন্ত ইজি টারগেট। ওরা যদি আপনাকে ক্রাশ করে তা হলে আমার কী আর ক্ষতিবৃদ্ধি বলুন! আমি চাইলেই আর একজন স্মার্ট এফিসিয়েন্ট সেক্রেটারি পেয়ে যাব। কিন্তু ক্ষতিটা হবে যদি আপনার কাছ থেকে ওরা এন এম-র হদিশটা পেয়ে যায়। তাই বলছি, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিন।

এন এম? সেটা আবার কী?

আর একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করুন, বুঝতে পারবেন। আপনি যে ব্রেনলেস এ কথা আমি বলছি না। গ্রে-ম্যাটার কিছু কম, এই যা। কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুও যদি অ্যাক্টিভেট করা যায় তা হলে একজন মোটামুটি বোকাকে দিয়েও কাজ চলতে পারে। আপনি যদি এই গ্রে-ম্যাটারগুলোকে...

ওঃ, ইউ আর হরিবল। এন এম মানে কি নীল মঞ্জিল? আমি আজই যে সেখানে যাচ্ছি!

ববি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান করুন যেন কেউ আপনার টেলিফোনে ট্যাপ করে থাকে। দয়া করে এন এম-এর কথা ভুলে যান, ওর ত্রিসীমানায় আপনার যাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু কেন?

ইউ আর আন্ডার অবজারভেশন মাই ডিয়ার। স্ক্যাম কিড, স্ক্র্যাম।

একটু তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে বসে রইল লীনা। হাতে বোবা টেলিফোন। ববি লাইন কেটে দিয়েছেন।

অনেকক্ষণ বাদে বিবশ হাতে টেলিফোনটা ক্র্যাডলে রাখল লীনা। তারপর সারা শরীরে এক গভীর অবসাদ নিয়ে উঠল। আজ একটু অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছে ছিল তার। নীল মঞ্জিল নামক

জায়গাটিকে আবিষ্কার করতে যাবে। ববি সেই প্রস্তাবে জল ঢেলে দিলেন।

জল ঢেলে দিলেন আরও অনেক কিছুর ওপর। ববি বেঁচে আছেন জেনে যে আবেগটা থরথরিয়ে উঠেছিল বুকের মধ্যে, লোকটা মার খেয়েছে শুনে যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল, সবই ভেসে গেল সেই জলে।

মার খেয়েছে ঠিক হয়েছে। খাওয়াই উচিত ওরকম অসভ্য লোকের।

কথা ছিল আজ তার সঙ্গে দোলনও যাবে। ঠিক ন'টায় দোলন আসবে। তারপর একসঙ্গে বেরোনোর কথা।

প্রোগ্রামটা পালটাতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে তারা?

লীনা আর শুতে গেল না। দাঁত মাজল, ব্যায়াম করল, স্নান করল।

বেলা ন'টার একটু আগেই চোব-চোর মুখে ভয়ে ভয়ে ফটক পেরিয়ে দোলনকে ঢুকতে দেখল লীনা। সে তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তেরছা হয়ে আসা কবোষ্ণ রোদ গায়ে শুষে নিচ্ছে। দোলনের হাবভাব দেখে হেসে ফেলল। গোবেচারা আর কাকে বলে!

এসো দোলন, ব্রেকফাস্ট খাওনি তো?

খেয়েছি।

বাঃ, আর আমি যে তোমার জন্যই বসে আছি না-খেয়ে! কী খেয়েছ?

ওঃ, সেসব মিডলক্লাস ব্রেকফাস্ট। আবার খাওয়া যায়।

বাঁচালে। শোনো, আজ আমাদের সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে না।

দোলনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হচ্ছে না! কেন বলো তো?

আমার বস বারণ করেছে।

বসটা কে? ববি তো পটল তুলেছেন।

মোটেই না। বেঁচে আছে।

বাঁচা গেল। কেউ মরেছে-টরেছে শুনলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লীনার। দোকান খুলতে যাচ্ছেন বলে মা খুব ব্যস্ত। ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে দেখতে প্রোটিন বিস্কুট আর ওটমিল খাচ্ছিলেন।

মা, এই যে দোলন!

কে বলো তো?

আমার বন্ধু।

ওঃ, দ্যাট চ্যাপ! বসুন আপনি। আজ তো সময় নেই, অন্যদিন ভাল করে আলাপ হবে।

এই বলে খাবার একরকম অর্ধসমাপ্ত রেখে মিসেস ভট্টাচার্য বেরিয়ে গেলেন।

দোলন সপ্রতিভ হয়ে বলল, আমাকে উনি তেমন পছন্দ করলেন না কিন্তু।

জানি। তোমার বেশি লোকের পছন্দসই হওয়ার দরকারও নেই। একজন পছন্দ করলেই যথেষ্ট।

সেও কি করে?

সন্দেহ হচ্ছে?

একটু সন্দেহ থেকেই যায় লীনা। তুমি কত বড় ঘরের মেয়ে।

আই হেট দিস সেট আপ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো! চলল, বেরিয়ে পড়ি। আজ চমৎকার রোদ উঠেছে। চনচনে শীত। এরকম দিনে একদম নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে দু’জনেই উঠে পড়ল।

গাড়িটা নেবে লীনা?

নিশ্চয়ই। গাড়ি ছাড়া মজা কিসের? তবে অন্য গাড়ি। ফিয়াট। বাবা দিল্লি গেছে, বাবার গাড়িটাই নিচ্ছি।

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে আনল লীনা। দোলন আর সে পাশাপাশি বসল। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

তুমি কখনও বারুইপুর গেছ?

বহুবার। আমার এক পিসি থাকে যে।

চলো তা হলে পিসিকে টারগেট করি আজ।

চলো, বহুকাল পিসিকে দেখতে যাইনি। বারুইপুর দারুণ জায়গা।

দক্ষিণের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিল লীনা। ক্রমে গড়িয়া-টড়িয়া পেরিয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা এবং চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চারধারে।

লীনা!

কী?

একটা গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছে আমাদের। দেখেছ?

তো! ওই কালো গাড়িটা? মনে হচ্ছে পন্টিয়াক।

অনেকক্ষণ ধরে দেখছি।

দাঁড়াও, আমাদেরই ফলো করছে কি না একটু পরীক্ষা করে দেখি। সামনে একটা ডাইভারশন দেখা যাচ্ছে না?

ওটা কাঁচা রাস্তা। কোথায় গেছে ঠিক নেই।

তবু দেখা যাক। আমরা তো বেশি দূর যাব না। একটু গিয়েই ফিরে আসব।

বলতে বলতে লীনা গাড়িটাকে ডানধারের রাস্তায় নামিয়ে দিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা নামল বটে, কিন্তু তারপরই খটাং একটা শব্দ হল পিছনে। হু-উস করে হাওয়া বেরিয়ে গেল ডানদিকের চাকা থেকে।

লীনা! কী হচ্ছে বলো তো!

সামওয়ান ইজ শুটিং অ্যাট আস।

তা হলে মাথা নামিয়ে বোসো। ওঃ বাবা, এরকম বিপদে জীবনে পড়িনি।

লীনা তার হ্যান্ডব্যাগটা খুলে পিস্তলটা বের করে নিয়ে বলল, সেভ ইয়োর লাইফ ইন ইয়োর ওন ওয়ে। আমি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব।

লীনা এক ঝটকায় দরজাটা খুলে নেমে পড়ল। আজ তার পরনে স্লাক্স আর কামিজ, তাই চটপট নড়াচড়া করতে পারছিল সে। দরজাটা খোলা রেখে তার আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে সে পিস্তল তুলল।

মাত্র হাত দশেক দূরে পন্টিয়াকটা বড় রাস্তায় থেমে আছে। দু'জন লোক অত্যন্ত আমিরি চালে নেমে এল গাড়ি থেকে। পরনে দু'জনেরই গাঢ় রঙের প্যান্ট আর ফুলহাতা সোয়েটার। দু'জনেই নিরস্ত্র।

লীনা তীব্র স্বরে বলল, আই অ্যাম গোয়িং টু শুট ইউ রাসক্যালস।

দুজনেই ওপরে হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে বলল, ডোন্ট শুট প্লিজ। উই ওয়ান্ট টু টক।

একজনকে চিনতে পারল লীনা। সেই সাদা পোশাকের পুলিশ।

কী চান আপনারা?

আমরা শুধু আপনার পিস্তলটা বাজেয়াপ্ত করতে চাই। আর কিছু নয়।

সেটা সম্ভব নয়। আর এগোলে আমি গুলি চালাব।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি গুলি চালাবেন না। পুলিশকে গুলি করা সাংঘাতিক অপরাধ।

আপনারা পুলিশ নন। ইমপস্টার।

আমরা যথার্থই পুলিশ। আই ডি-র লোক।

তার প্রমাণ কী?

আমাদের আইডেনটিটি কার্ড দেখবেন?

ওখান থেকে ছুড়ে দিন। কাছে আসবেন না।

একজন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লীনার দিকে ছুড়ে দিল।

রোদে একটা ঝকঝকে বিভ্রম তুলে কার্ডটা ছুটে এল লীনার দিকে। তারপর লীনা কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা পটকা ফাটবার মতো আওয়াজ হল। সামান্য একটু ধোঁয়া এবং অদ্ভুত গন্ধ।

লীনা কেমন যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল। নড়তে পারল না।

পরমুহূর্তেই দু'টি লোক কাছে এসে দাঁড়াল তার। একজন পিস্তল কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে। অন্যজন ভারী মায়াভরে লীনাকে পরে দাড় করাল।

যে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছিল সে গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দোলনের দিকে তাকাল।

দোলনের অবস্থা সত্যিই লজ্জাজনক। সে ফিয়াটের সামনের সিটের স্বল্প পরিসর ফাঁকের মধ্যে উবু হয়ে বসে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে।

বেরিয়ে আসুন।

দোলন কাতরস্বরে বলল, আমি তো কিছু করিনি।

লোকটি খুব মোলায়েম গলায় বলল, না। আপনি কিছুই করেননি। সেইজন্য আপনাকে আমরা ধরছিও না। বেরিয়ে আসুন।

দোলন বেরিয়ে এল।

লোকটা দোলনের কাঁধে একটা হাত রাখল। মৃদু হেসে বলল, এ ব্রেভ ম্যান, কোয়াইট এ ব্লেড ম্যান।

তারপরই লোকটার ডান হাত দোলনের নাকের কাছে একটা চমৎকার জ্যাব মারল। নক-আউট জ্যাব। মুষ্টিযোদ্ধারাও যা সামাল দিতে পারে না দোলন তা কী করে সামলাবে?

সামনের সিটেই পড়ে গেল দোলন। চিৎপাত হয়ে।

লোকটা দরজাটা বন্ধ করে দিল। কাছাকাছি লোকজন বিশেষ নেই। যারা আছে তারা বেশ দূরে।

দু'জন লোক লীনাকে একরকম বহন করে নিয়ে এল পন্টিয়াকে। গাড়িটা এর মধ্যে কলকাতার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা উঠতেই তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করল।

গোটা ব্যাপারটা ঘটে যেতে ছ'-সাত মিনিটের বেশি লাগেনি।

বেশিক্ষণ নয়, মিনিট দশেক বাদেই লীনার চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে দেখল প্রকাণ্ড গাড়ির পেছনের সিটে অস্বস্তিকর রকমের নরম ও গভীর গদিতে সে বসে আছে। দু'পাশে দু'জন শক্ত সমর্থ পুরুষ।

লীনা হঠাৎ একটা ঝটকা মেরে উঠে পড়ার চেষ্টা করল, বাঁচাও! বাঁচাও!

দু'জন লোক পাথরের মতো বসে রইল দু'পাশে। বাধা দিল না।

কিন্তু লীনা কিছু করতেও পারল না। তার কোমর একটা সিট বেল্ট-এ আটকানো।

আপনারা কী চান?

সেই সাদা পোশাকের ছদ্ম-পুলিশ বলল, আমরা নীল মঞ্জিল যেতে চাই মিস ভট্টাচার্য। আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আজ আপনার সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল।

আমি ও-নাম জন্মেও শুনিনি।

শুনেছেন মিস ভট্টাচার্য। আজ সকালে ববি রায়ের সঙ্গে আপনার টেলিফোনে যেসব কথা হয়েছে তা টেপ করা আছে আমাদের কাছে।

আপনারা আমার টেলিফোন ট্যাপ করেছিলেন?

না করে উপায় কী? ববি রায়কে আমরা বাগে আনতে পারিনি বটে, কিন্তু আমাদের সেখানে যেতেই হবে।

আমি পথ চিনি না।

মিস ভট্টাচার্য, মেয়েদের নানারকম অসুবিধে আছে। আপনি নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে চান না।

আমি আপনাদের ভয় পাই না। আমি চেঁচাব।

লাভ নেই। এ গাড়ি সাউন্ডপ্রুফ। বাইরে থেকে ওয়ান-ওয়ে গ্লাস দিয়ে গাড়ির ভিতরে কিছু দেখাও যায় না। আপনি বুদ্ধিমতী, কেন চেঁচিয়ে শক্তিক্ষয় করবেন?

আপনি পুলিশ নন।

না হলেই বা। আপনার কী যায় আসে? ববি রায়ের সিক্রেট নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাচ্ছেন? দোলন! দোলনের কী হল?

কিছু হয়নি। চিন্তা করবেন না। তবে বলে রাখি ও লোকটা কিন্তু আপনার বিপদে বাঁচাতে আসেনি।

লীনা এত বিপদের মধ্যেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পুরুষরা সবাই সমান।

১৬. একটা ট্র্যাংক কল

গার্লস আর ইডিয়টস। ডাউনরাইট ইডিয়টস। দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে ববি আর একটা ট্র্যাংক কল করলেন। আবারও কলকাতায় এবং ডিম্যান্ড কল।

ইন্দ্রজিতের ঘুম-ঘুম গলা পাওয়া গেল একটু বাদে, হ্যাল্লো।

শোনো ইন্দ্রজিৎ, দেয়ার ইজ এ গুড নিউজ ফর ইউ। আমি এইমাত্র আবিষ্কার করেছি যে তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গাড়ল নও, সম্ভবত তোমার চেয়েও গাড়ল আছে। অন্তত দেয়ার ইজ এ কিন কমপিটিশন। এবং সে একটি মেয়ে।

ইন্দ্রজিতের ঘুম চড়াক করে কেটে গেল। প্রায় আর্তনাদ শোনা গেল টেলিফোনে, আপনি? আপনি বেঁচে আছেন স্যার? মাইরি, ভূত নন তো!

আমি ভূত হলে তোমার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার। শোনো, আমাকে আর এক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার প্লেন ধরতে হবে। তবু হয়তো সময়মতো পৌঁছোতে পারব না। ইন দা মিন টাইম তুমি যার কাছে বোকামিতে হেরে গেছ তার বাড়ি চলে যাও। শি হ্যাজ বাঙ্গলড় এভরিথিং।

কে স্যার? লীনা?

ওঃ ইউ আর রাইট। থ্যাংক ইউ। যতদূর মনে হয়েছে মিসেস ভট্টাচারিয়া বিপাকে পড়বেন। ভদ্রমহিলাকে ফেস করার দরকার নেই। জাস্ট ফলো হার।

ফলো! ও বাবা, আমার যে গাড়ি নেই।

তোমার অনেক কিছুই নেই ইন্দ্রজিৎ, আমি জানি। কিন্তু গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। টাকা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। যা বলছি করো।

বিপদটা কি খুব সিরিয়াস স্যার? আমার কিন্তু সেই ভাইট্যাল জিনিসটাও নেই।

কোনটা? বুদ্ধি? বুদ্ধির দরকার নেই গাড়ল, দরকার শুধু বুলডগের মতো টেনাসিটি আর অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট।

বুদ্ধি নয় স্যার। ভাইট্যাল জিনিসটা হল রিভলভার।

তোমার না থাকলেও চলবে। মিসেস ভট্টাচারিয়ার আছে। সময় নেই, ছাড়ছি।

একটা কথা স্যার। উনি কিন্তু মিসেস নন, মিস...

ববি ফোন রেখে দিলেন। আর চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম পেলে বড় ভাল হত। কিন্তু কপালে নেই।

ববি নার্সিং হোমের চার্জ মিটিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন। তিরবেগে গাড়ি চলল এয়ারপোর্টের দিকে।

বোম্বে থেকে ভায়া নাগপুর কলকাতার ফ্লাইটে যথেষ্ট ভিড় হয়। ববি সম্ভবত জায়গা পাবেন না। স্বাভাবিকভাবে পাবেন না, কিন্তু অস্বাভাবিক পন্থায় পেয়ে যেতেও পারেন।

নিজের শারীরিক কষ্টের দিকটা ততটা বোধ করতে পারছেন না ববি। সম্ভবত পেথিডিন ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়া এখনও রয়েছে। আর রয়েছে তীব্র উদ্বেগ। মেয়েটা যে কেন নীল মঞ্জিলের কথাটা ফোনে বলে দিল। ওর টেলিফোন ট্যাপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে ববি নিশ্চিত। ঘুমন্ত বোম্বের রাস্তায় পোড়া রবারের গন্ধ ছড়িয়ে ববি রায় ফিয়াটটাকে শুধু ওড়াতে বাকি রাখলেন।

এয়ারপোর্ট। ববি জানেন, এই ফ্লাইটটা গন্ডগোলের। এই ফ্লাইটে এমন দু'একজন থাকতেও পারে যারা ববিকে বিশেষ পছন্দ করবে না।

ববি সুতরাং সহজ পথে গেলেন না। লাউঞ্জের ভিড়াক্রান্ত অঞ্চলটা এড়িয়ে তিনি একটু একা রইলেন। লক্ষ রাখলেন এম্বার্কেশন টিকিটের কাউন্টারে। জনা পঞ্চাশেক লোকের লাইন। কাউন্টার খুলতে এখনও হয়তো মিনিট দশ-বারো দেরি আছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ববিকে। হঠাৎ দেখা গেল সেই দৈত্যাকার যুবক এবং আর একজন আধা সাহেব গোছের লোক হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টারের দিকে গেল।

ববি জানেন ওদেরও টিকিট নেই। ওরা চেষ্টা করবে শেষ মুহূর্তে টিকিট কাটবার। যদি অবশ্য অন্যরকম বন্দোবস্ত থেকে থাকে।

ববির দ্বিতীয় ধারণাই সত্য। দু'জনে লাইনে দাঁড়াল। হাতে টিকিট।

আনন্দে হাতে হাত ঘষে ববি ইংরিজিতে বললেন, চমৎকার।

পাশ থেকে একজন বুড়োমতো বিদেশি লোক হঠাৎ ধমকের স্বরে ইংরিজিতে বলে উঠল, কী চমৎকার? আঁ! চমত্তারটা আবার কী? ইটস এ লাউজি কান্ট্রি, ইটস এ লাউজি এয়ারলাইনস অ্যান্ড ইউ আর লাউজি পিপল। জানো প্লেন আজও আধ ঘণ্টা লেট!

দ্যাটস এ গুড নিউজ।

ববি স্থানত্যাগ করলেন।

দৈত্যাকার যুবকটির কাঁধে যখন আলতো করে টোকা দিলেন ববি তখনও জানতেন না প্রতিক্রিয়াটা এরকম হবে। লোকটা ফিরে ববির দিকে তাকিয়ে প্রথমে স্ট্যাচু হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তারপর তার চোয়ালটা ঝুলে পড়ল নীচে।

ববি চাপা গলায় বললেন, একটা আপসরফায় আসবে? আমি মারদাঙ্গা এবং হিরোইকস একদম পছন্দ করি না।

দৈত্য এবং তার সঙ্গী কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর দৈত্য দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কীরকম আপসরফা?

কথাটা একটু আড়ালে হলে ভাল হয়। সাপোজ ইউ গো টু দি ইউরিন্যালস?

দৈত্যটা একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, কোনও চালাকি করলে তুমি খুব বিপদে পড়বে।

ববি মুখখানা করুণ করে বললেন, দি অডস আর ভেরি মাচ এগেইনস্ট মি।

তুমি কাল রাতে আমার পকেট থেকে–

ববি মাথা নেড়ে বললেন, জানি, জানি, আমি টাকাটাও ফেরত দিতে চাই।

দৈত্যটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, চলো।

এ সময়টায় ইউরিন্যাল ফাঁকাই থাকে। তিনজন যখন ঢুকল তখন মাত্র একজন উটকো লোক প্রাতঃকৃত্য সারছিল। সে বেরিয়ে যেতেই দৈত্যটা হঠাৎ প্রকাণ্ড থাবায় ববির বাঁ কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এবার বলল বাছাধন!

দ্বিতীয়জনের হাতে যেন জাদুবলে দেখা দিল একটা রিভলভার।

ববি রায় অত্যন্ত খুশির হাসি হাসলেন। এরকমই তো চাই। ঠিক এইরকমই তো চাই।

দৈত্যকে হাতে রেখে ববি প্রথম রিভলভারওয়ালার ঠিকানা নিলেন, তার বাঁ পা নব্বই ডিগ্রি উঠে গেল সমকোণে এবং শরীরকে একটি তৈলাক্ত দণ্ডের উপর ঘুরিয়ে অপ্রত্যাশিত ক্যারাটে কিকটি সংযুক্ত করে দিলেন আততায়ীর মাথায়। এত দ্রুত যে কিছু ঘটতে পারে তা লোকটা কল্পনাও করেনি কখনও। তার রিভলভার গিয়ে সিলিং-এ ধাক্কা খেয়ে খটাস করে মেঝেয় পড়ল এবং তারও আগে লোকটা নিজের ভগ্নাংশ হয়ে ঝরে পড়ল মেঝেয়।

দৈত্যটা এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ববি তাকে আদেশ করলেন, লোকটাকে তুলে পায়খানার মধ্যে ভরে দাও। কুইক...

কিন্তু দৈত্য তখনও এই অশরীরী কাণ্ডটাকে মাথায় নিতে পারেনি। তাই অবাক হয়ে ববির দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারল না।

কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় ববির হাতে নেই। তিনি খুবই দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর ওয়ালজ নাচের মুদ্রায় প্রায় শত মাইল বেগে তিন ফুট এগিয়ে গিয়ে ঘুসিটা চালালেন দৈত্যের থুতনিতে।

ভূমিকম্প এবং মহীরূহ পতনের শব্দ সৃষ্টি করে দৈত্য পড়ে গেল।

ববি তার টিকিটটা কুড়িয়ে নিলেন। আর দু'জনকে হেঁচড়ে নিয়ে দুটি ছোট ঘরে ভরে দিলেন।

ভাগ্য ভালই ববির। যে মিনিট তিনেক সময় ব্যয় হল তার মধ্যে কেউ ইউরিন্যালে ঢোকেনি।

রিভলভারটা ববি তুলে নিলেন বটে, কিন্তু পকেটে ভরলেন না। আর একটি ছোট ঘরে সেটি কমোডের মধ্যে নিক্ষেপ করে বেরিয়ে এসে লাইনে দাঁড়ালেন।

যে ওজনের মার দিয়েছেন দু'জনকে তাতে ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের আগে চেতনা ফেরার কথা নয়। অবশ্য কপাল খারাপ হলে কত কী তো ঘটতে পারে।

ঘটল না অবশ্য। এম্বাকেশন কার্ড নিয়ে ববি রায় গিয়ে এক কাপ কফি খেলেন। ইউরিন্যালটা একবার দেখে এলেন। দুটি ছোট ঘর এখনও বন্ধ, কোনও অঘটন ঘটেনি।

একটু বাদেই সিকিউরিটি চেক-এর ঘোষণা শুনতে পেলেন ববি। তার ঢোলা পোশাক এবং কামানো চিবুক বোধহয় সিকিউরিটির লোকেরা বিশেষ পছন্দ করল না। কিন্তু ববির পকেটে টাকা আর রুমাল ছাড়া কিছু নেই দেখে ছেড়ে দিল।

প্লেন আকাশে উড়বার পর ববি স্বস্তি বোধ করলেন। ক্ষুধার্তের মতো খেলেন ব্রেকফাস্ট এবং নাগপুরের আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

কলকাতায় যখন প্লেন নামল তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সোয়া এগারোটা। কত কী ঘটে যেতে পারে এব মধ্যে, কত কী…।

ববি লীনার নম্বর ডায়াল করলেন। বাড়ি নেই।

ববি তাড়াহুড়ো করলেন না। আগে দাড়ি কামালেন, দাঁত মাজলেন, তারপর জীবাণুনাশক মিশিয়ে গরম জলে স্নান করলেন। তটস্থ বাবুর্চি চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিল। অম্লানবদনে ববি দ্বিতীয়বার প্রাতরাশ সারলেন। সারাদিন খাওয়া হয় কি না হয় কে জানে!

দু’-একটা ছোটখাটো জিনিস পকেটে আর হাতব্যাগে পুরে নিলেন ববি। তারপর তোক্সওয়াগনটা বের করলেন গ্যারাজ থেকে।

এমন সময় একটা অ্যাম্বাসাডার এসে বাড়ির সামনে থামল এবং অতিশয় উত্তেজিত ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নেমে এল ইন্দ্রজিৎ। তার দুটো চোখ বড় বড়, মুখখানা লাল।

স্যার!

বলো ইন্দ্রজিৎ।

আপনি এসে গেছেন! বাঁচালেন। ব্যাড নিউজ স্যার, ভেরি ব্যাড নিউজ।

ববি চোখ ছোট করে ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ইজ শি কিল্ড?

কোনও সন্দেহ নেই।

কী হয়েছে সংক্ষেপে বলল।

আপনার ফোন পেয়েই আমি আমার এক চেনা গ্যারাজ থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করি। পার ডে আড়াইশো টাকা প্লাস তেল আর মবিল...

ওটা বাদ দাও, তারপর বলো।

মিস ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে ঠিক সাতটায় হাজির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। উইদাউট ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড উইদাউট ইভন এ প্রপার কাপ অফ টি...

কাট দি ব্রেকফাস্ট।

ওঃ আপনি তো আবার অন্যের খাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করেন না। হ্যাঁ, বলছিলাম, ঠিক ন'টায় ওই ছেলেটি আসে, দোলন। মিস ভট্টাচার্য আর দোলন একটা ফিয়াট নিয়ে বেরোয় ন'টা চল্লিশ নাগাদ। এবং একটা পন্টিয়াক গাড়ি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ফলো করতে শুরু করে।

তুমি কী করলে?

আমিও পন্টিয়াকটাকে ফলো করতে থাকি তবে একটু ডিসট্যান্স রেখে। আপনি তো জানেনেই স্যার যে আমার রিভলভার নেই।

তারপর কী হল?

গড়িয়া ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাইল যাওয়ার পর মিস ভট্টাচার্য কেন কে জানে, গাড়িটা হঠাৎ একটা কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই পন্টিয়াক থেকে গুলি ছুটল। পিছনের একটা টায়ার ফেঁসে গিয়েছিল। আর লীনা-কী বলব স্যার-ঝাঁসীর রানি, রানি ভবানী, জোয়ান অব আর্ক, দেবী চৌধুরানি ছেঁকে তৈরি মেয়ে স্যার।

কী করল সে?

গাড়ি থেকে নেমে এসে পিস্তল নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি চালাতে লাগল।

মাই গড।

একটু দূরে ছিলাম তাই ঠিক বলতে পারব না ব্যাপারটা কী হয়েছিল। তবে একটু বাদেই দেখলাম গুন্ডাদের গুলিতে মেয়েটা পড়ে গেল...

ননসেন্স! ওকে গুলি করবে কেন গাড়লেরা? ওকে মারলে তো সবই গন্ডগোল হয়ে যাবে।

আগেই বলেছি স্যার, আমি একটু দূরে ছিলাম। খুব স্পষ্ট করে দেখিনি। তবে মনে হল মেয়েটা উন্ডেড। গুন্ডারা গিয়ে ওকে ধরে গাড়িতে তুলে হাওয়া।

কোনদিকে গেল তারা?

আমি ফলো করিনি স্যার। দোলন নামে সেই ছোকরাকে গুন্ডারা ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছিল। আমি দোলনকে রেসকিউ করি। কিন্তু তার কাছ থেকে তেমন কোনও ইনফরমেশন পাইনি। ছোকরাটা আমার চেয়েও কাওয়ার্ড।

হুঁ। তোমার চেয়ে বোকা এবং তোমার চেয়েও কাওয়ার্ড যে আছে তা আমার জানা ছিল না। এনিওয়ে লীনাকে কোথায় নিয়ে গেছে তার খানিকটা আন্দাজ আমার আছে। গাড়িতে ওঠো। ইউ আর গোয়িং ফর এ রাইড।

স্যার, একটা কথা।

কী কথা?

গোলাগুলি চলবে নাকি?

চলতে পারে।

তা হলে আমার হাতেও একটা অস্ত্র থাকা দরকার।

না, বুন্ধু! তোমার হাতে অস্ত্র দেওয়া মানে আমার নিজের বিপদ ডেকে আনা।

আমি কোনওদিন বন্দুক পিস্তল হাতে পর্যন্ত নিতে পারিনি।

ভালই করেছ।

ববি গাড়ি ছাড়লেন। সল্টলেকের রাস্তায় গাড়িটা বিদ্যুৎবেগে ছুটতে লাগল।

স্যার।

বলো।

গাড়িটা মাটির দু'ইঞ্চি ওপর দিয়ে যাচ্ছে। টের পাচ্ছেন?

চুপ করে বসে থাকো।

এ গাড়িতে সিটবেল্ট থাকা উচিত ছিল।

আছে, লাগিয়ে নাও।

ইন্দ্রজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলল, আমি নাস্তিক ছিলাম। কিন্তু এখন আর নই। মা কালী বাবা মহাদেব, রক্ষা করো!

ববি ঘুরপথ নিলেন না। সহজ এবং সবচেয়ে শর্টকাট ধরে তীব্রগতিতে এগোতে লাগলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সেতু পার হয়ে বোম্বে রোডে এসে পড়লেন।

স্যার।

বলো।

আপনি কি–?

কী? বললে আপনি রেগে যাবেন না তো স্যার?

তা হলে বোলো না।

বলছিলাম আপনি কি বাই এনি চান্স ওই মেয়েটিকে একটু পছন্দ করেন?

ববি দু-দুটো লরিকে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ টালমাটাল হয়ে আবার সামলে নিয়ে বলল, গুলিতে নয় আমরা মরব অ্যাকসিডেন্টে। স্যার একটু সামলে–

তুমি কিছু বলছিলে ইন্দ্রজিৎ?

বললেও তা উথড্র করে নিচ্ছি, স্যার।

শোনো, গার্লস আর ইডিয়টস। এই মেয়েটি যদি পর্বতপ্রমাণ বোকা না হত তা হলে আমাদের এইভাবে আজ নাকাল হতে হত না। মেয়েটা হয়তো মরবে, কিন্তু তার আগে একটা মস্ত সর্বনাশ করে দিয়ে যাবে।

ইন্দ্রজিৎ একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি অত্যন্ত পাষাণ-হৃদয়ের লোক, স্যার।

হ্যাঁ। আমার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই।

তাই দেখছি।

সেই ছোকরাটার কী হল? দোলন না কে যেন।

হোপলেস কেস স্যার। ছোকরাকে আমি এসপ্লানেড অবধি একটা লিফট দিয়েছিলাম। ছোকরাটা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে আমাকে একটা থ্যাংক ইউ অবধি বলল না।

সেটাই স্বাভাবিক, ইন্দ্রজিৎ। বাঙালিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ভীষণ কমে যাচ্ছে। একদিন হয়তো দেখা যাবে বাঙালি মাত্রই মেয়েছেলে। কেউ শাড়ি পরে, কেউ বা প্যান্ট শার্ট বা ধুতি পাঞ্জাবি। বাট বেসিক্যালি সবাই স্বভাবে চরিত্রে মেয়েছেলে।

আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার, সামনে একটা পেট্রলট্যাংকার... ওরে বাবা...

ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজে ফেলল। একটা প্রবল বাতাসের ঝাপটা আর গাড়িতে একটা ভীষণ ঝাঁকুনি টের পেল সে। তারপর চোখ খুলে দেখল, পরিষ্কার রাস্তায় গাড়ি মসৃণ ছুটছে।

আপনি কি মোটরকার জাম্পিং জানেন স্যার? ট্যাংকারটাকে কাটালেন কী করে?

কাটালাম দু’চাকায় ভর করে। পিছনের ডানদিকের চাকা রাস্তায় ছিল না।

মা কালী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী!

আচমকাই বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ডাইভারশনে ঢুকে পড়লেন। রাস্তাটা এক সময় পাকা ছিল, এখন খানাখন্দে ভরা।

ইন্দ্রজিৎ।

স্যার।

বাতাসে পেট্রলের গন্ধ পাচ্ছ?

ইন্দ্রজিৎ বাতাস কে বলল, না।

আমি পাচ্ছি। ওরা এই পথেই গেছে।

লীনাকে যেখানে আনা হল সেই জায়গাটা লীনা চিনতে পারল না। তবে নিশ্চয়ই খিদিরপুর ডক-এর কাছাকাছি কোনও অঞ্চল। লীনা জাহাজের ভো শুনতে পেল একবার।

ঘিঞ্জি একটা নোংরা বসতি ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িটা একটা মস্ত পুরনো বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়ল। নিশ্চয়ই এককালে জমিদারবাড়ি ছিল। এখনও পাথরের পরি আর ফোয়ারা রয়েছে। বাগানে প্রচুরডালিয়া ফুটে আছে।

গাড়িবারান্দার তলায় গাড়িটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে দরজা খুলে দিল।

ছদ্ম-পুলিশ যুবকটি বলল, এরপর থেকে আর আমাদের কিছুই করার থাকল না মিস ভট্টাচার্য।

তার মানে?

১৭. নীল মঞ্জিলের ঠিকানা

আপনি যদি আমাদের নীল মঞ্জিলের ঠিকানা দিয়ে দিতেন তা হলে আমরা আপনাকে রিলিজ করে দিতে পারতাম। কিন্তু খামোখা জেদ ধরে থেকে আপনি নিজের বিপদ ডেকে আনলেন।

লোকটা নেমে দাঁড়াল। একটা রূঢ় পুরুষালি হাত এসে লীনাকে প্রায় এ্যাচকা টানে নামিয়ে নিল গাড়ি থেকে। লীনা নিজেকে সামলাতে পারল না। গাড়ির দরজায় হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল রাস্তার পাথরে। হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গেল কি না কে জানে! লীনা ব্যথায় কাতরে উঠল, উঃ মাগো!

কিন্তু সেই আর্তনাদে কান দেওয়ার মতো কেউ তো ছিল না। পুরুষালি হাতটাই তার বাহু সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ফের দাড় করাল। এবার লোকটাকে দেখতে পেল লীনা। যাঁড়ের মতো মোটা ঘাড় আর মাঠের মতো চওড়া বুকওয়ালা এক বিদেশি। গায়ে একটা লাল টকটকে টি-শার্ট, পরনে কালচে ট্রাউজার্স। তার হাতে জাহাজের ছবিওয়ালা উল্কি।

লোকটা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, কাম অন, মিট ডেভিড।

লোকটা কি জাহাজি? হলেও হতে পারে। লীনা জাহাজি বিশেষ দেখেনি। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, রাসক্যাল, মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো না?

লোকটা ঝকঝকে দাঁত আর গোলাপি মাড়ি বের করে হেসে বলল, আই অ্যাম এ হোমোসেক্সয়াল। আই ডোন্ট বদার ফর গার্লস। বাট দেয়ার আর আদারস হু উইল লাইক ইউ ইন বেড... কাম অন...

প্রায় হেঁচড়ে লীনাকে সিঁড়ির ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে দাড় করিয়ে দিল লোকটা।

ছোট একখানা ঘর। ঘরে বিশেষ কোনও আয়োজনও নেই। শুধু একখানা কাঠের সস্তা টেবিল এবং তার দু' ধারে মুখোমুখি দুটো চেয়ার। ওপাশের চেয়ারে একজন লোক বসে আছে। এই পরিবেশে লোকটা নিতান্তই বেমানান। তার কারণ লোকটার চেহারা দার্শনিকের মতো। গায়ের ফরসা সাহেবি রং রোদে-জলে তামাটে মেরে গেছে। মাথার চুল পাতলা। চোখের নীল তারা দুটির ভিতরে এক সুদুর অন্যমনস্কতা রয়েছে। লম্বা মুখ। শরীরটা মেদহীন এবং একটু রোগাই। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই।

উঠে দাঁড়িয়ে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইংরিজিতে বলল, গ্ল্যাড টু সি ইউ, মিস। প্লিজ বি সিটেড।

এই পর্যন্ত চমৎকার। লীনা লোকটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে কি না তা নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল। সে হাত বাড়াল। তবে চেয়ারে বসে ইংরিজিতে বলল, তোমরা কী চাও? কেন আমাকে ধরে এনেছ?

লোকটা একটু চিন্তিতভাবে লীনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আর ইউ ইন লাভ উইথ ববি রায়?

এ কথায় কেন যেন হঠাৎ কঁ করে উঠল লীনার মুখ নাক কান। সে ঝামরে উঠে বলল, না, কখনও নয়। আই হেট হিম।

লোকটা তবু চিন্তিতভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর আনমনে একটু মাথা নেড়ে অত্যন্ত ভদ্র, নরম এবং প্রায় বিষণ্ণ গলায় কবিতা পাঠের মতো করে ইংরিজিতে বলল, ববি রায় অত্যন্ত, আবার বলছি, অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। সব মেয়েরই উচিত তার সংস্রব থেকে দূরে থাকা এবং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া।

কিন্তু কেন?

ববিই কি আপনাকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়নি?

দিয়েছে। লোকটা পাষণ্ড।

ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম। শুধু তাই নয়, ববি একজন চোর, খুনি ও আন্তর্জাতিক গুন্ডা। ববি চোরাই চালানদারদের সর্দার। আমি জানি, ববি একজন বিশ্ববিখ্যাত ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্টও বটে। কিন্তু সেসব বিদ্যা সে লাগায় গোয়েন্দাগিরিতে এবং খারাপ কাজে। সে তার মস্তিষ্ক বিক্রি করে বড়লোক হতে চায়। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্র আছে যারা ববিকে মারার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার পুরস্কার দিতে চায়। ববিকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মিস ভট্টা... ভট্টা...

লীনা বলল, লীনা উইল ডু।

লোকটা হেসে বলল, লীনা, ববি যে সিক্রেটটা তার কম্পিউটারে লুকিয়ে রেখেছিল সেটা তুমিই কিল করেছ। কিন্তু তাতে আমাদের দরকার নেই। সিক্রেটটা তুমি জানো। তুমি জানো নীল মঞ্জিলটা ঠিক কোথায়। যদি দয়া করে ঠিকানাটা বলে দাও, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সেখানে কী আছে?

লোকটা গম্ভীর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লীনার দিকে আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমরা তাও সঠিক জানি না। কিন্তু ববি রায়কে টার্মিনেট করার একটা চুক্তি আমরা নিয়েছি।

টার্মিনেট!–বলে লীনা লোকটার দিকে চেয়ে রইল। তার বুকে তো কই সেতারের ঝংকার বেজে উঠল না। বরং ববির নাতিদীর্ঘ ছিপছিপে চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আনমনা, ব্যস্তবাগীশ ববি, নারীবিদ্বেষী ববি, ঠোঁটকাটা ববি। তাকে এরা মেরে ফেলবে?

লোকটা খুব মনোযোগ দিয়ে লীনার মুখের ভাব পাঠ করে নিচ্ছিল। মৃদু হেসে বলল, অবশ্য সেটা আজই হবে। ববি কী করেছে জানো? বোম্বেতে সে আমাদের অন্তত পাঁচ জন লোককে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আমাদের সবরকম প্রতিরোধ ভেঙে পালিয়েছে। বোম্বে এয়ারপোর্টে আমার এক বন্ধুকে আজ সকালেই সে এমন মার মেরেছে যে, লোকটা মারা গেছে সেরিব্রাল হেমারেজে। ববি এখনও পলাতক। আমরা তাকে ভীষণভাবে চাই মিস লীনা। কিন্তু ববির সঙ্গে পরে আমাদের বকেয়া চুকিয়ে নেব। তার আগে তার সাধের নীল মঞ্জিলটা আমরা ধ্বংস করে দিতে চাই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, নীল মঞ্জিলে কী আছে?

লোকটা আবার একটা শ্বাস ফেলে বলল, ববি সেখানে পৃথিবীর মহত্তম সর্বনাশের আয়োজন করছে। শোনো মিস লীনা, সব টেকনিক্যাল জারগন তুমি বুঝবে না। তোমাকে শুধু জানাতে চাই যে, ববি আজ সকালে বোম্বে টু ক্যালকাটা ফ্লাইটটা অ্যাভেল করেছে। আমাদের লোক চব্বিশ ঘণ্টা ববির বাড়ির ওপর নজর রাখছিল। মাত্র আধঘণ্টা আগে সে আমাদের টেলিফোনে জানিয়েছে যে, ববি তার বাড়িতে পৌঁছে গেছে। আমাদের ধারণা সে কিছুক্ষণের মধ্যেই নীল মঞ্জিলে যাবে। আর সেখানেই আমরা আজ ববি রায়কে পৃথিবী থেকে মুছে দেব।

তা হলে তোমরা ববি রায়কেই কেন ফলো করছ না?

তার কারণ, সেখানে আমাদের মাত্র একজন লোক মোতায়েন আছে। তার পক্ষে ববি রায়ের সঙ্গে পাল্লা টানা অসম্ভব। হয় ববি তাকে খুন করবে, না হলে চোখে ধুলো দেবে। ববিকে আমরা খুব ভাল চিনি, মিস লীনা। তা ছাড়া আমরা ববির আগেই নীল মঞ্জিলে পৌছোতে চাই।

লীনা ঠোঁট কামড়াল। ববি কলকাতায়। সেই ফ্যাসফ্যাসে ভুতুড়ে গলা আজ ভোর রাতেই তো টেলিফোনে শুনেছিল লীনা। লোকটা ছিল নার্সিং হোমে। দারুণ রকমের জখম। তা হলে কোন মন্ত্রবলে লোকটা পৌঁছে গেল কলকাতায়?

মিস লীনা, আমাদের হাতে কিন্তু বিশেষ সময় নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীনা। আর যাই হোক, এদের হাতে নোকটাকে মরতে দেওয়া যায় না।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, বলব না।

মিস লীনা, তুমি ববি রায়ের প্রেমে পড়োনি তো? তোমাকে দেখে তত বোকা কিন্তু মনে হয় না।

আবার ঝাঁ ঝা করে উঠল লীনার নাক মুখ কান। রক্তোচ্ছাসে ভেসে যেতে লাগল শরীর। সে চোখ বুজল। দাঁতে দাঁত চাপল। তারপর বলল, না।

তা হলে ববির প্রতি তুমি এত দুর্বল কেন? আমি তো তোমাকে বলেছি যে, ববি একজন চোর, গুন্ডা, তার কোনও নীতিবোধ নেই, সে হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, জানি না কেন। তবে বলব না।

মিস লীনা, আমি অকারণে কঠোর হতে চাই না। আমরা মরিয়া মানুষ, তোমার সাহায্য চাইছি।

লীনা লোকটার দিকে তাকাল। দার্শনিকের মতো ভাবাল ও সুন্দর মুখশ্রী-বিশিষ্ট এই বিদেশিকে তার খারাপ লাগছিল না। ভদ্র, নম্র কণ্ঠস্বর, চোখের চাউনিতে কিছু ধূসরতা। কিন্তু এটাও ওর সত্য। পরিচয় নয়। ছদ্ম-দার্শনিকতার অভ্যন্তরে কোনো রয়েছে ভাড়াটে

সৈন্যের উদাসীন হননেচ্ছা। মানুষ মারা বা মশা মারার মধ্যে কোনও তফাত নেই এর কাছে।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না।

মিস লীনা বিশ্বাস করো, আমাদের হাতে সত্যিই সময় নেই।

আমি বলব না।

মিস লীনা, আর একবার ভাবো।

না, না, না–

তা হলে দুঃখের সঙ্গে তোমাকে কিন্তু পশুর হাতে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তারা পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে। নারীমাংসলোভী, কামুক, বর্বর।

লীনা আপাদমস্তক শিউরে উঠে বলল, না–

উপায় নেই মিস লীনা। মুখ তোমাকে খুলতেই হবে।

লোকটা একটা বেল টিপল। আর মুহূর্তের মধ্যে সেই লাল গেঞ্জি পরা লোকটা এসে লীনার পাশে দাঁড়াল। তারপর লীনা কিছু বুঝে উঠবার আগেই তাকে একটা ডল পুতুলের মতো তুলে নিল দু'হাতে।

লীনা আর্ত চিৎকার করল বটে কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। এরকম প্রকাণ্ড মানুষ সে জীবনেও দেখেনি। কোনও মানুষের শরীরে যে এরকম সাংঘাতিক জোর থাকতে পারে তাও সে কখনও কল্পনা করেনি।

লোকটা তাকে একটা ঘরে এনে ছেড়ে দিল। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর একটা মাট পাতা। ছ'জন দানবীয় চেহারার লোক শুধুমাত্র খাটো প্যান্ট পরে অপেক্ষা করছে ছ'টা টিনের চেয়ারে।

লোকটা লীনাকে কিছু বুঝতেই দিল না। চোখের পলকে তার কামিজ ছিঁড়ে ফেলল কাগজের মতো, ছিঁড়ে ফেলে দিল চুড়িদারের পায়জামা। শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরা লীনা উন্মাদের দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে দেখল।

কী হবে? আমার কী হবে? কী করবে এরা?

ছ'টা লোক উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। লাল গেঞ্জিওয়ালা লোকটা লীনার কানের কাছে শ্বাস ফেলে বলল, আমি হোমোসেক্সুয়াল না হলে...

পিঠে একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল লীনা। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার আগেই একটা প্রকাণ্ড হাঁটু চেপে বসল তার কোমরে। একটা হ্যাঁচকা টানে উড়ে গেল ব্রা।

লীনা চেঁচিয়ে উঠল, বলছি! বলছি! প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দাও।

হয়তো তবু ছাড়ত না। এদের মনুষ্যত্ব বলে কিছু তো নেই। কিন্তু ঠিক এই সময়ে দার্শনিক লোকটা এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। একটা হাত ওপরে তুলে বলল, ড্রেস হার।

লোকগুলো কলের পুতুলের মতো সরে গেল আবার। ছেঁড়া পোশাকটাই কুড়িয়ে নিল লীনা। দু'চোখে অবিরল অশ্রু বিসর্জন করতে করতে, ফুঁসতে ফুঁসতে সে পোশাক পরল।

চলো, মিস লীনা। সময় নেই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রকাণ্ড পন্টিয়াকটা লীনার নির্দেশমতো ছুটতে শুরু করল। উন্মাদের মতো গতিবেগ। লীনার দু'ধারে এবার দুজন। সেই দার্শনিক আর লাল গেঞ্জি। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে সেই দু'জন, যারা তাকে ধরে এনেছে।

বোম্বে রোড ধরে কতটা যেতে হবে তা কম্পিউটারের বাণী উদ্ধৃত করে বলে গেল লীনা। পাকা ড্রাইভার সুনির্দিষ্ট একটা জায়গায় এসে বাঁ ধারে একটা ভাঙা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। চারদিকে গাছপালা, লোকালয়হীন পোভড়া জায়গা।

দার্শনিক খুনি হঠাৎ বলে উঠল, ওই তো!

সামনে একটা বাগানঘেরা বাড়ি। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ওপর বৈদ্যুতিক তারের বেড়া। ফটকে অটো- লক।

গাড়ি ফটকের সামনে থামতে দার্শনিক লোকটা নামল। ফটকটা দেখে নিয়ে একটু চিন্তিত মুখে গাড়িতে ফিরে এসে তার সঙ্গীদের উদ্দেশে অতিশয় দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল।

লাল গেঞ্জি নেমে লাগেজ বুট খুলে একটা অ্যাটাচি কেস বের করে আনল। লীনা গাড়িতে বসেই দেখল, দার্শনিক লোকটা অ্যাটাচি খুলে ছোটখাটো নানা যন্ত্রপাতি বের করে ফটকের ওপর কী একটু কারসাজি করল। একটু বাদেই ফটক খুলে গেল হাঁ হয়ে।

খুব ধীরে ধীরে গাড়িটা ঢুকে পড়ল বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে। ফটকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

তারপর যা ঘটল তা সাধারণত মিলিটারি অপারেশনেই দেখা যায়। অত্যন্ত তৎপর লোকগুলো চটপট কয়েকটা সাব-মেশিনগান নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল প্রস্তুত হয়ে।

দার্শনিক লোকটা গাড়ির দরজা খুলে বলল, এসো মিস লীনা।

মানসিক বিপর্যয়টা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি লীনা। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। এই নারীজন্মকে সে ধিক্কার দিচ্ছিল মনে মনে। সে মরতে ভয় পেত না, কিন্তু

যে শাস্তি তাকে দিতে চেয়েছিল তা যে মৃত্যুরও অধিক। শুধু মেয়ে বলেই এরা তাকে এভাবে ভেঙে ফেলতে পারল। নইলে পারত না।

লীনা টলমলে পায়ে নামল। চারদিকে পরিষ্কার রোদ। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। শান্ত, নির্জন, নিরীহ পরিবেশ। কিন্তু একটু বাদেই এখানে ঘটবে রক্তপাত, বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে বারুদের গন্ধ..

বাড়ির সদর দরজাটাই বিচিত্র। একটি ইস্পাতের মোটা পাত আর তার গায়ে একটা স্লট। কয়েকটা অত্যন্ত খুদে আলপিনের মাথার মতো বোতাম রয়েছে স্লটের নীচে।

মিস লীনা, এটা একটা ইলেকট্রনিক দরজা। তুমি কি কোড জানো?

না। আমি আর কিছু জানি না।

জানো মিস লীনা। তুমি কয়েকটা কোড জানো। এই যে পিনহেড দেখছ এটাতে কোড ফিড করা যায়। বলো মিস লীনা।

লীনা অসহায়ভাবে চারদিকে একবার তাকাল। তারপর কে জানে কেন তার চোখ ভরে জল এল। চোখ বুজে ফেলতেই নেমে এল সেই অশ্রুর ধারা। সে চাপা স্বরে শুধু একটাই কোড উচ্চারণ করল, আই লাভ ইউ।

লোকটা দ্রুত হাতে বোতাম টিপে গেল একটার পর একটা।

আশ্চর্যের বিষয় স্টিলের দরজাটা নিঃশব্দে বলবিয়ারিং-এর খাঁজের ওপর দিয়ে সরে গেল।

এসো মিস লীনা। তুমি আরও কোড জানো। এখানে সব কোডই কাজে লাগবে।

লীনা ঘরে ঢুকল। প্রথম ঘরটায় অন্তত চারটে ভিডিয়ো ইউনিট। তার সামনে রয়েছে চাবির বোর্ড। কিন্তু কেউ নেই কোথাও।

লোকটা লীনার দিকে চেয়ে বলল, ভেরি আপটুডেট, ভেরি সফিস্টিকেটেড।

কী?

তুমি সুপার কম্পিউটারের কথা জানো?

শুনেছি।

এ সব হল তারই কাছাকাছি জিনিস। ববি ইজ এ জিনিয়াস। কিন্তু জিনিয়াস যদি বিপথগামী হয় তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

তোমরা ববিকে মারবে কেন? তোমরা নীল মঞ্জিল ভেঙে দাও, কিন্তু ওকে মারবে কেন?

ওকে মারতেই হবে মিস লীনা। ওকে মারার জন্য আমি সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছি।

কিন্তু কেন?

কারণ, ববির মৃত্যু চায় পৃথিবীর কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্র। আমি তাদের প্রতিনিধি মাত্র।

শোনো, ববির অনেক দোষ জানি। কিন্তু কাউকে মেরে ফেলা কি ভাল?

মিস লীনা, তুমি ববির প্রেমে পড়োনি তো?

না, না, কখনওই নয়।

বলল লীনা। তবু কেন যে তার মুখ চোখ কান সব ফের আঁ আঁ করে উঠল। কেন যে রক্তের স্রোত পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে লাগল ধমনীতে ধমনীতে।

সেগুন গাছ তুমি চেনো ইন্দ্রজিৎ?

সেগুন! সে আর শক্ত কী? চেনো? বাঃ, বলো তো ওই গাছটা কী গাছ?

অফকোর্স সেগুন।

বাঃ, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেন জানো ইন্দ্রজিৎ? এ দেশে গাড়লেরাই উন্নতি করে, বুদ্ধিমানেরা মার খায়।

তা বটে স্যার, কিন্তু আমি তেমন নিরেট গাড়ল নই। আমার মনে হচ্ছে গাছ নিয়ে আপনার কিছু ভাব এসেছে। কবিতা লেখার পক্ষে অবশ্য সেগুন বেশ জুতসই শব্দ। বেগুন দিয়ে মেলে, লেগুন দিয়ে মেলে।

তবু এ গাছটা সেগুন নয়, শাল।

স্যার, এই অসময়ে আপনি আমাকে বটানি বোঝাচ্ছেন কেন?

বটানি নয়, স্ট্র্যাটেজি। যতদূর অনুমান, শত্রুপক্ষ নীল মঞ্জিল পেনিট্রেট করেছে এবং কয়েকটা সাব-মেশিনগান আমাদের স্বাগতম জানাতে প্রস্তুত। সুতরাং ঢোকার আগে শত্রুপক্ষের অবস্থান জেনে নেওয়া ভাল। তুমি গাছ বাইতে পারো ইন্দ্রজিৎ?

আমি স্যার, কলকাতার ছেলে, গাছ পাব কোথায় যে বাইব?

তাও বটে। তা হলে গাড়িতেই বসে থাকো। আমি ওই সেগুন গাছটায় একটু উঠব। কিন্তু গ্লাসটা দাও তো।

ববি দূরবিনটা বুকে ঝুলিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাস্তার পাশে দাড় করানো ভোক্সওয়াগনটায় চুপ করে বসে রইল ইন্দ্রজিৎ। যেদিকে ববি গেলেন সেদিকে প্রায় নির্নিমেষ চেয়ে রইল সে।

হঠাৎ তার মনে হল ওপর থেকে ঝপ করে জঙ্গলের মধ্যে কী একটা পড়ে গেল। সম্ভবত ববির দূরবিন। ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে জিনিসটার কাছে ছুটে গেল। ঘন বুক সমান ঘাসের মধ্যে অবশ্য কিছু দেখতে পেল না। তাই ওপর দিকে তাকিয়ে চাপা জরুরি গলায় ডাকল, স্যার! স্যার! আপনার দূরবিনটা যে পড়ে গেছে, সেটা টের পেয়েছেন?

ববিকে সে ডালপালার ফাঁক দিয়ে আবছা ভাবে দেখতেও পাচ্ছে। লোকটা ওপরে উঠছে। খুব বেশিদূর ওঠেনি। দুরবিনটা নিয়ে না গেলে লোকটা কিছুই দেখতে পাবে না ওপর থেকে।

সে আবার ডাকল, স্যার! স্যার! থামুন। আপনি ভুল করছেন।

ববি থামলেন। তারপর ডালপালার কিছু শব্দ হল। উৎকণ্ঠিত উর্ধ্বমুখ ইন্দ্রজিৎ সহসা দেখতে পেল, একটা কেঁদো মদ্দা হনুমান তার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে।

ইন্দ্রজিৎ সভয়ে বলল, সরি স্যার। থুড়ি, শুধু সরি।

হনুমানটা একটু দাঁত খিচিয়ে আবার গাছে উঠতে লাগল। ঘাস জঙ্গলের মধ্যে একটা শুকনো ডাল খুঁজে পেল ইন্দ্রজিৎ। দুরবিন নয়, হোঁতকা হনুমানটার চাপে ডালটা ভেঙে পড়েছিল।

ইন্দ্রজিতের অনুমান ভুল হল বটে, কিন্তু খুব বেশি ভুল নয়। কারণ মদ্দা হনুমানটা জীবনে এমন প্রতিদ্বন্দ্বী আর দেখেনি। ফুট বিশেক ওপরে ওঠার পর সে পাশের সেগুন গাছে হুবহু তারই মতো দ্রুত ও অনায়াস ভঙ্গিতে আর-একজনকেও গাছ বাইতে দেখল। এবং আশ্চর্যের কথা, প্রতিদ্বন্দ্বী হনুমান নয়, মানুষ। এবং আরও আশ্চর্যের কথা, লোকটা বিড় বিড় করে বলছিল, নীচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরবে... ওঃ বাবা কিছুতেই তাকাব না।

বাস্তবিকই ববির প্রচণ্ড ভার্টিগো। দোতলা থেকেও ববি নীচের দিকে তাকাতে পারেন না।

দুরদর্শী রবীশ পঁচিশ ফুট ওপরে সেগুন গাছের তিনটি মজবুত ডাল জুড়ে একটি মাচান বেঁধেছিলেন। সম্পূর্ণ আড়াল করা চমৎকার ওয়াচ টাওয়ার। এখানে বসে বাড়িটা অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

ভার্টিগোয় আক্রান্ত ববি প্রায় চোখ বুজে মাচানের ওপর উঠে এলেন। হাঁফটাফ তার সহজে ধরে। কিন্তু কালকের ওই অমানুষিক মারের ব্যথা এখনও দাঁত বসিয়ে আছে সর্বাঙ্গের কালশিটেয়। ববি মাচানে বসে প্রথমেই পকেট থেকে সিরিঞ্জ আর একটা পেথিডিনের অ্যাম্পুল বার করলেন। তারপর বাঁ হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে ওষুধটা চালিয়ে দিলেন ভিতরে। এখন ব্যথাটাকে না মারলে তিনি যুঝতে পারবেন না, অবশ্য যদি লড়াইটা'ইতিমধ্যে হেরে না গিয়ে থাকেন।

দুরবিনটা চোখে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন ববি। তার অত্যন্ত শক্তিশালী দুরবীক্ষণেও শুধু একটা মস্ত পন্টিয়াক গাড়ি ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না। ববি তাড়াহুড়ো করলেন না। ওত পেতে বসে রইলেন। যদিও সময় বয়ে যাচ্ছে তবু অন্য উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পর একটা ঝোপের আড়াল থেকে একজনকে বেরিয়ে আর-একটা ঝোপের আড়ালে যেতে দেখতে পেলেন ববি। তারপর একটা পেয়ারা গাছের ডালে আর একজনকে আবিষ্কার করা গেল। ছাদের রেলিং-এর আড়ালে আর-একজন। চতুর্থজন ফটকের পাশে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়ানো। প্রত্যেকের হাতেই উজি সাব-মেশিনগান। আর কাউকে দেখা গেল না। একটা পন্টিয়াক গাড়িতে এর বেশি লোক আনা সম্ভবও নয়। পঞ্চম জন নিশ্চয়ই লীনাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে।

ববি প্রায় চোখ বুজে নেমে এলেন।

ইন্দ্রজিৎ!

স্যার, এসে গেছেন তা হলে? আমি ভাবছিলাম আপনি টারজানের মতো লতা ধরে ঝুল খেয়ে অলরেডি ভিতরে পৌঁছে গেলেন বুঝি!

শোনো ইন্দ্রজিৎ, চার-চারটে সাব-মেশিনগানকে এড়ানো বিশেষ রকমের শক্ত কাজ।

ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণ হয়ে গিয়ে বলল, বিশেষ বিপজ্জনকও।

আমাদের গাড়িটা অবশ্য সম্পূর্ণ বুলেটপ্রুফ। আমরা ইচ্ছে করলে ওদের অগ্রাহ্য করে ঢুকে যেতে পারি। কিন্তু ওরা গুলি চালালে যে লোকটা লীনাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে সে সতর্ক হয়ে যাবে। সে লীনাকে তখন ব্যবহার করবে হোস্টেজ হিসেবে।

তা হলে কী করবেন স্যার?

আমি ভাবছি, কী করে শব্দটা এড়ানো যায়। একটিও গুলির শব্দ হলে চলবে না।

না স্যার, গুলি জিনিসটা ভালও নয়।

তুমি টারজানের কথা বলছিলে না?

বলেছিলাম স্যার, তবে উইথড্র করে নিচ্ছি।

উঁহু, উইথড্র করার কিছু নেই। টারজানের মতো ঢুকে লাভ নেই। আমাদের ঢুকতে হবে ইঁদুরের মতো। বাড়ির পিছন দিকে একটা নালা আছে। বড় নর্দমা, এসো, ওটা দিয়েই ঢুকতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ গাড়ি থেকে নামল। বলল, আপনার সঙ্গে কাজকারবার করা মানেই প্রাণ হাতে করে চলা। আমার বউ থাকলে আজই বিধবা হত।

না, ইন্দ্রজিৎ তোমার বউ চিরকুমারীই থেকে যাবে। এসো। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই।

নর্দমা দিয়ে যে আমি কখনও কোথাও ঢুকিনি স্যার।

প্রয়োজনে ডিটেকটিভদের ছুঁচের ফুটো দিয়েও ঢুকতে হয়। গর্দভ, এটা নোংরা নর্দমা নয়।

কথা বলতে বলতে দু'জনে হাঁটছিল। বাড়ির পিছন দিকটায় অসমান জংলা জমি। কাঁটাঝোপ। বিছুটি বন। ভারী নির্জন। গাঁয়ের গোরুরাও এদিকে চরতে আসে না।

বাড়ির পিছন দিকে এসে একটা বুক সমান ঘাসজঙ্গলে ঢুকলেন ববি। পিছনে ইন্দ্রজিৎ। নর্দমার মুখটা জঙ্গলে একরকম ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ববি হিপ পকেট থেকে একটা ভাজকরা ছুরি বের করে ঝপাঝপ কিছু ঘাস কেটে মুখটা পরিষ্কার করলেন।

ইন্দ্রজিৎ বলল, কিন্তু স্যার, নর্দমার মুখে যে শিক লাগান। ঢুকবেন কী করে?

ববি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কোটের পকেট থেকে ছোট্ট প্লায়ারের মতো একটা যন্ত্র বের করলেন। জং ধরা শিক সেই যন্ত্রের দাঁতে চোখের পলকে কুড়ুক ফড়ুক করে কেটে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে ববি ভিতরে ঢুকলেন। পিছনে ইন্দ্রজিৎ।

সামনে বিস্তর ঝোপঝাড়ের দুর্ভেদ্য আড়াল। ববি তারই ফাঁক দিয়ে সামনেটা নিরীক্ষণ করে নিলেন! চাপা গলায় বললেন, ইন্দ্রজিৎ, পিছনের দিকে দু'ধারে দু'জন পাহারা দিচ্ছে। একজনকে আমি কাবু করতে পারব। অন্যজনকে তুমি পারবে?

না স্যার। এমন ঠান্ডা মাথায় কথাগুলো বলছেন, যেন কাজটা একেবারে জলভাত।

তুমি কি কাওয়ার্ড ইন্দ্রজিৎ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সাব-মেশিনগানওয়ালা লোকের সঙ্গে খালি হাতে পাল্লা টানতে গেলে আমি চূড়ান্ত কাওয়ার্ড।

ববি সামান্য ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে লোকদুটোকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে নজরে রাখছিলেন।

ইন্দ্রজিৎ, এই সুযোগ। একজন রাউন্ড দিতে আড়ালে গেল।

দেখতে পাচ্ছি স্যার। কিন্তু–

ববি ব্যস্ত গলায় বললেন, শোনো ইন্দ্রজিৎ, এই বাগানে ইলেকট্রনিক বার্গলার অ্যালার্মের তার পাতা আছে। কোনও তার ছুঁয়ো না। সাবধান।

ববি ঘাসজঙ্গলে ডুব দিলেন। আর তারপর ইন্দ্রজিৎ শুধু বাতাসের হিলিবিলির মতো একটা ঢেউ দেখতে পেল তৃণভূমিতে। তারপর একটা ঝোপের আড়ালে উঠে দাঁড়ালেন ববি। লোকটার এই অন্যায্য সাহস দেখে ইন্দ্রজিৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অস্ত্রধারী লোকটা তার দিকে তাকাল।

ইন্দ্রজিৎ নড়বার আগেই কুইক-ফায়ার অস্ত্রটিতে ঝাঝরা ও দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারত। লোকটা সাব-মেশিনগানটা তুলেও ছিল। কিন্তু তারও আগে ঝোপের আড়াল থেকে একটা বাজপাখি যেন উড়ে গেল লোকটার দিকে।

কী হল, তা বুঝতেও পারল না ইন্দ্রজিৎ। শুধু দেখল, অস্ত্রধারী চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে এবং ববি তাকে টেনে ঘাসজঙ্গলের দিকে নিয়ে আসছেন।

দ্বিতীয় পাহারাদারকে ববি নিলেন অত্যন্ত গাঁইয়ার মতো। লোকটা রাউন্ড সেরে ফিরে আসছিল। ববি ঝোপের আড়াল থেকে হাত তুললেন। হাতে একখানা আধলা ইট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভীষিকা ফাস্ট বোলারের মতোই ইটখানাকে ছুড়লেন ববি। লোকটার কপালটা কেটে হাঁ হয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে শান্ত হয়ে গেল লোকটা। ববি তাকেও ঘাসজঙ্গলে ঢুকিয়ে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে ডাকলেন। ‘

আপনি স্যার, অমিতাভ বচ্চন ধর্মেন্দ্র আর মিঠুনের ককটেল।

তারা কারা?

আমাদের ন্যাশানাল হিরো।

তাই নাকি?

আপনার মধ্যে একটু বুস লি-রও টাচ আছে।

ধন্যবাদ। এখন চলল। আরও দুটোকে ম্যানেজ করতে হবে। তাদের মধ্যে একটা আস্ত একখানা গরিলা।

আপনি আগে চলুন স্যার। একটা কথা। দুটো সাব-মেশিনগানের একটা কি আমি নিতে পারি?

ভয় পাচ্ছ ইন্দ্রজিৎ?

স্যার, আপনাকে সম্মান দিচ্ছি। সাব-মেশিনগান তুমি স্পর্শ করবে না। ওসব ভদ্রলোকের অস্ত্র নয়। এসো। ববি ধীরে ধীরে এগোলেন। দেয়াল ঘেঁষে।

যে লোকটার চেহারা সত্যিই গরিলার মতো, সে দু’খানা থামের মত পা দু’দিকে ছড়িয়ে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়ানো।

ববি হঠাৎ অনুচ্চ একটি শিস দিলেন। লোকটা বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়াল। তারপর অবিকল একই দ্রুততায় তুলল তার অস্ত্র।

ববির অস্ত্র নেই কিন্তু তিনি নিজেই এক অস্ত্র। প্রথম একখানা আধলা ইট মারলেন ববি। তারপর শরীরটিকে কুণ্ডলীকৃত স্প্রিং-এর মতোই তিনি পাক খাইয়ে ছুড়ে দিলেন। এবং সোজা গিয়ে পড়লেন লোকটার বিশাল বুকের ওপর।

জীবনে এরকম অসম লড়াই দেখেনি ইন্দ্রজিৎ। বেশ লিলিপুটের সঙ্গে বডিংন্যাগের লড়াই। কিন্তু কে দানব এবং কে বামন, তা লড়াই দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল, ববি লোকটার ঘাড় এক হাতে ধরে অন্য হাতে তাকে ঠেলে বৃত্তাকারে দৌড় করাচ্ছেন নিজের চারধারে। এ দৃশ্য পঞ্চাশ টাকা টিকিট কেটেও দেখা যাবে না। ইন্দ্রজিৎ প্রাণভরে দেখতে লাগল।

তারপর ববি লোকটাকে হঠাৎ ছেড়ে দিলেন। লোকটা কেমন যেন টলতে লাগল। ববি এরপর লড়াইটা শেষ করলেন থুতনিতে খুব সযত্ন-রচিত একখানা ঘুসি মেরে। দানবটা ভূমিশয্যা নেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ছিল। ঘুসিখানা খেয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে উপুড় হয়ে আউট হল।

ববি ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ছাদে আর একজন আছে। কিন্তু আপাতত তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। নাউ, এন্টার দা ড্রাগন।

এ বাড়িতে ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখার জন্য একটা গর্ভগৃহ ছিলই। সেই পাতাল-ঘরটিকে একটি সুপ্রসর মনিটারিং কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন রবীশ। অত্যন্ত সুরক্ষিত, অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ঘর। অন্তত পঞ্চাশটা টার্মিনাল। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির একটি জটিল ধাঁধা।

টার্মিনালগুলির সামনে বসে আছে লোকটা। একটার পর একটা চাবি টিপছে, নব ঘোরাচ্ছে, আর ভিডিয়োতে ভেসে উঠছে নানা ছবি। শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কিছু কণ্ঠস্বর। নানা রঙের প্যাটার্ন ফুটে উঠছে ভিডিয়ো ইউনিটগুলিতে। অকস্মাৎ দৃশ্যমান হল একটা বিপুলায়তন গিরিখাত। দ্রুত সরে গেল। দেখা গেল অস্পষ্ট একটা ভূখণ্ড। লোকটা একটা চাবি টিপতেই ছবিটা স্থির হল। ফের একটা কলকাঠি নাড়তেই ছবিটা দ্রুত জুম করে

এগিয়ে এল। তারপর অত্যন্ত খুঁটিনাটি সব জিনিস দেখা যেতে লাগল। একটা মস্ত গম্বুজওয়ালা বাড়ি, চারদিকে শস্যক্ষেত্র।

লোকটা ফিরে তাকাল লীনার দিকে। তারপর গভীর বিস্ময়ে বলে উঠল, মাই গড!

লীনা সভয়ে চেয়ে রইল লোকটার দিকে।

লোকটার চোখে পাগলের মতো দৃষ্টি। সম্পূর্ণ অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে সে বলল, দে হ্যাভ পেনিট্রেটেড দা স্যাটেলাইটস!

লীনা এর জবাবে কী বলতে পারে? বিশেষত তাকে তো কোনও প্রশ্নও করা হয়নি।

লোকটা স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল, মার্কিন এবং রুশ স্যাটেলাইটগুলো যা দেখছে তার সবই হুবহু ফুটে উঠছে টার্মিনালে! এ কি বিশ্বাসযোগ্য? মিস লীনা, ববি রায়ের আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। আই প্রোনাউন্স হিম গিল্টি অফ ইন্টারন্যাশনাল এসপিয়োনেজ, ডাবল এজেন্টিং অ্যান্ড ব্রিচ অফ ফেইথ। হিজ ওনলি পানিশমেন্ট ইজ ডেথ...

জল্লাদের কাজটা কি তুমিই করবে?

ঘরে বজ্রপাত হলেও এর চেয়ে বেশি চমকাত না লীনা। ইস্পাতের দরজাটা আধো খোলা। দরজায় ববি। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে মুখোমুখি তাকাল ববির দিকে।

ববি রায়।

হ্যাঁ।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, তুমি ববি রায় নও। আমি হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখছি।

দেখছ। ববি রায় তো দুঃস্বপ্নই। তুমি একটু আগেই আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছ, আমি সেটা শুনেছি। তোমার পিছনে কারা আছে এবং তুমিই বা কে?

লোকটা মুখে কোনও জবাব দিল না। কিন্তু তার ডান হাতখানা আকস্মিকভাবে ওপরে উঠল এবং একটি বিদ্যুৎশিখার মতো কিছু ছুটে গেল হাত থেকে।

ববি স্প্রিং-এর পুতুলের মতো মেঝেয় বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক এরকমভাবে কোনও মানুষের শরীর যে ক্রিয়া করতে পারে, তা জানা ছিল না লীনার। লোকটা কি আসলে মানুষ নয়? রোবট?

ফ্লাইং নাইফটা স্টিলের দরজায় লেগে খটাস করে মেঝেয় পড়ল।

ববি অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, যাকে মারার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়, তাকে মারতে পারাটাও কঠিন কাজ।

লোকটা সম্পূর্ণ ভূতগ্রস্তের মতো ববির দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানতাম তুমি বিপজ্জনক। পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি হাইটের ববি রায় যে ধুরন্ধর লোক তা আমাকে জানানো হয়েছে। মিস্টার রায়, বাইরে আমার চারজন সশস্ত্র পাহারাদার ছিল, তাদের চোখ তুমি এড়ালে কী করে?

ববি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চোখ এড়াব সেরকম কপাল করে কি আমি জন্মেছি? আমি ততটা ভাগ্যবান নই। চারজনের মধ্যে তিনজনের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে।

লোকটা হাঁ করে চেয়ে রইল ববির দিকে। তারপর বলল, কিন্তু জোয়েল? ওই দানব যে হেভিওয়েট বক্সার!

ববি মাথা নাড়লেন, দুঃখিত। একজন হেভিওয়েট বক্সারকে এতটা অপমান করা আমার ঠিক হয়নি।

লোকটা মাথা নাড়ল, বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না। এর মধ্যে কোনও একটা চালাকি আছে।

বলতে বলতে লোকটা ঠেলে রিভলভিং চেয়ারটা সরিয়ে দিল।

ববি, আমি তোমাকে খুন করতে এসেছি। আর খুন আমাকে করতেই হবে... আমি জন দি টেরর।

ববি নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠান্ডা গলাতেই বললেন, আমি তোমাকে চিনি ডার্টি জন। মানবসমাজের পক্ষে তুমি এক নোংরা আবর্জনা। তুমি প্রতিভাবান খুনি ছাড়া আর কিছু নও।

জন খুব ধীরে এগিয়ে গেল।

ততোধিক ধীরে ববি এগোলেন। ববি জানেন, জন আর পাঁচজনের মতো নয়। শরীর ও মনের ওপর তারও নিয়ন্ত্রণ সাংঘাতিক। মানুষ তখনই লড়াই জেতে যখন শরীর ও মন দুইকেই সে একত্রিত করতে পারে। তখন নিজেই সে এক ভয়াবহ অস্ত্র। অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অজেয়। ইন আর ইয়ান। ইয়ান আর ইন।

লীনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, শুনুন বস। প্লিজ। আপনাকে ও মেরে ফেলবে।

ক্ষুরধার নিষ্পলক চোখে ববি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনি ঘরের বাইরে যান। ইন্দ্রজিৎ আপনাকে ওপরে নিয়ে যাবে।

আমি আপনাকে মরতে দিতে পারি না।

আমি অমর।

কিসের একটা ধাক্কা খেয়ে লীনা ছিটকে পড়ল মেঝেয়। একটু বাদে বুঝল, পরিসর তৈরি করার জন্য জন তাকে সরিয়ে দিয়েছে মাত্র।

ববি ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন। জন তার কারাটে কিকটি চালিয়ে দিল ববির কোমরে।

বেড়ালের মতো শুন্যে লাফিয়ে উঠলেন ববি। আর মাটিতে পড়ার আগেই পা বিদ্যুতের বেগে নেমে এল জনের মুখে।

কিন্তু জন অন্তত চার ফুট বাঁয়ে সরে গেছে ততক্ষণে। ববি মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার হাতের কানার কোপটি বসাল ববির ঘাড়ে।

কী চমৎকার ভারসাম্য লোকটার শরীরে! ববি একটা ডিগবাজি খেয়ে চলে গেলেন পিছনে।

১৮. ক্ষতবিক্ষত শরীরে ববি

ক্ষতবিক্ষত শরীরে ববি অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে শারীরিক ও মানসিক লড়াই চালিয়েছেন। প্রতিপক্ষদের মধ্যে বিবেকহীন দৈত্য ও পেশাদার খুনির সংখ্যাই প্রবল। এতক্ষণ যে বেঁচে আছেন ববি, তা কেবল দৈবের বশে। কিন্তু আস্তে আস্তে ববির ক্ষতমুখগুলি বিষিয়ে উঠছে। কেটে যাচ্ছে ওষুধের ক্রিয়া। ববির রিফ্লেক্স ভাল কাজ করছে না। চোখে মাঝে মাঝে ঝাপসা দেখছেন।

প্রতিপক্ষ শুধু প্রবলই নয়, এ পর্যন্ত সর্বোত্তম। লড়াইটা জেতা ববির পক্ষে সাংঘাতিক প্রয়োজন। সুস্থ থাকলে কোনও সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন ববির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন বাড়তি জল ঢুকে পড়েছে। হাত তুলতে, পা তুলতে দেড়গুণ-দ্বিগুণ সময় লাগছে। পিঠ থেকে একটা ব্যথা উরু অবধি অবশ করে দিচ্ছে। মাথার ভিতরে প্রবল যন্ত্রণা। আর এ লড়াই লড়তে হচ্ছে শূন্যে লাফিয়ে, জমিতে পড়ে, শরীরে চুড়ান্ত ভারসাম্যের ওপর। এক চুল, এক পলের এদিক ওদিক হলেই একটি হাই পাওয়ার কিক বা কারাটে চপ খেয়ে চোখ ওলটাতে হবে।

প্রায় পনেরো মিনিট কেউ কাউকে ছুঁতে পারল না। লড়াই রইল সমান-সমান। কিন্তু আসলে সমান-সমান নয়। ববি যে আস্তে আস্তে নিজের শরীরের কাছে হার মানছেন তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন। আর সেটা বুঝতে পারছিল তার বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষও। ট্রাংক কল-এ সে জানতে পেরেছে ববি ওয়্যারহাউসে কী পরিমাণ পিটুনি গ্রহণ করেছেন তার শরীরে। সারা রাত ঘুম বলতে গেলে হয়নি। প্রতিপক্ষ এয়ারপোর্টের ঘটনাও জানে। সে জানে, ববিকে এই বাড়ির ভূগর্ভের ঘরে আসতে তিন-তিনটে সাব-মেশিনগানধারী গুন্ডার মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার মধ্যে একজন হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা। সুতরাং লোকটা ববিকে যতখানি পারে পরিশ্রান্ত করে তুলছিল। লোকটার নিজের রিফ্লেক্স চমৎকার।

নড়াচড়া বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন। তাই আহত পরিশ্রান্ত ববিকে সে আক্রমণের পর আক্রমণ রচনা করতে দিয়ে নিজেকে বারবার চকিতে সরিয়ে নিচ্ছিল।

ববি বুঝলেন, এভাবে পারা যাবে না। লড়াই তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ববি হঠাৎ বৃত্তটা ভেঙে এবং এ লড়াইয়ের নিয়মের তোয়াক্কা না করে আচমকাই সোজা সরল পথে লোকটার কোমর লক্ষ করে জোড়া পায়ে লাফিয়ে পড়লেন।

চমৎকার হালকা ও চকিত লাফ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই আকস্মিক দিক পরিবর্তনের ফলে লোকটা দিশাহারা হয়ে যেত। নিশ্চিত পরাজয় লেখা ছিল তার কপালে।

কিন্তু ভাগ্য মন্দ ববির। লোকটা ববির ওই বিভীষণ আক্রমণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল চিতাবাঘের তৎপরতায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত এক খোলা হাতের কোপ বসিয়ে দিল ববির মাথায়। হাতের কানার সেই দুর্দান্ত মার ববির মাথার খুলিতে ফেটে পড়ল। ববির চোখের সামনে সহসা ফুলঝুরির মতো আলোর বিন্দু নাচতে লাগল। অসাড় অবসন্ন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে ববিকে অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে দেখল। তারপর মুখ তুলে লীনার দিকে চাইল। ফিসফিস করে বলল, এ লোকটা মানুষ না অতিমানুষ তা কি তুমি জানো মিস লীনা?

লীনা অরুদ্ধ স্বরে বলল, মানুষ। একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, তুমি জানো না। তুমি জানো না এ লোকটা বম্বেতে আমার গ্যাং-এর হাতে ধরা পড়ার পর যে মার খেয়েছে তা দশটা লোককে ভাগ করে দিলেও তারা বোধহয় সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না। এ লোকটা আহত অবস্থায় আমার দু’জন অত্যন্ত শক্ত সমর্থ লোককে ঘায়েল করে পালায়। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এ

লোকটা আমার তিনজন সশস্ত্র সঙ্গীকে হারিয়ে এবং সম্ভবত অজ্ঞান বা হত্যা করে আমার পিছু নিয়েছে। তিনজনের মধ্যে একজন যে হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা তা তার চেহারা দেখে তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ। এর পরেও যেভাবে আমার সঙ্গে লড়ছিল তাতে যে-কোনও সময়ে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। এ লোকটা মানুষ নয়, মিস লীনা।

লীনা কোনও জবাব দিল না। টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে থরথর করে কাঁপছিল। এই ভীষণ পুরুষালি জীবন-মরণ লড়াই সে তো জন্মেও দেখেনি। এত হিংস্র, বর্বর, নিষ্ঠুর কিছু তার অভিজ্ঞতায় নেই। তার অস্তিত্ব আজ নাড়া খেয়ে গেছে ভীষণ।

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দেয়ালের চারদিকে কী যেন একটু খুঁজল আপনমনে। লীনার দিকে দৃকপাতও করল না। কিন্তু লীনা তাকে লক্ষ করছিল। লোকটা দেয়ালে একটু উঁচুতে ডিং মেরে পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কী যেন একটা অনুভব করল। লীনা লক্ষ করল, দেয়ালের গায়ে একটা লাল বোতাম।

লোকটা নিচু হয়ে মেঝের ওপর কিছু খুঁজল। তারপর একটা হাতলের মতো জিনিস ধরে টানতেই ম্যানহোলের ঢাকনার মতো একটা চৌকো ঢাকনা খুলে এল। লোকটা একটা টর্চ বের করে ভিতরটা দেখে নিল। নামল না। ঢাকনাটা আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে ভিডিয়োগুলো সব অফ করে দিল।

লীনা ধীরে ধীরে ববির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। নাড়ি চলছে। একটু ক্ষীণ। শ্বসটা যেন অনিয়মিত।

লোকটা লীনার দিকে ফিরে বলল, মিস লীনা, কোনও মহিলার সামনে তার ভালবাসার লোককে আমি খুন করতে চাই না।

লীনা জলভরা চোখ তুলল। চারদিকটা যেন ভাঙাচোরা। লোকটা যেন আবছা এক সিল্যুট।

লোকটা বলল, কিন্তু এই কাজটা করার জন্যই আমাকে কয়েক হাজার মাইল আসতে হয়েছে। আর এ কাজটায় ইনভলভড় লক্ষ লক্ষ টাকা। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ববির মতো বিশাল মানুষের মৃত্যুও হবে মহান। ওই যে দেয়ালে লাল বোতামটা দেখছ ওটা হল এই বাড়ির সুইসাইড কোড। বোধহয় দুমিনিটের ফিউজ আছে। আমার মনে হয়, তুমি ওকে ছেড়ে পালাবে না। যেমন তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে যেতে হবে মিস লীনা। ওই লাল বোতামটা টিপে দিলেই আমার মিশন শেষ।

লীনার লাল বোতামের কথা মনে পড়ল। তেমন বিপদ বুঝলে লীনাকেই বোতামটা টিপতে বলেছিলেন ববি রায় তাঁর চিঠিতে।

লীনা আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল, প্লিজ প্লিজ! আমাদের চলে যেতে দিন।

মিস লীনা, তুমি চলে যেতে পারো। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। ববিকে একা তার মহান মৃত্যু বরণ করতে দাও। সে তার নিজের সৃষ্টির সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চেয়ে সুন্দর আর কীই বা হতে পারে! আর তুমিও যদি ওর সঙ্গে সঙ্গে মহৎ হতে চাও তা হলে তো আমার কিছু করার। নেই।

মনুষ্যত্ব বলে কি কিছু নেই?

আছে মিস লীনা, আমি জানি আছে। কিন্তু আমাদের মতো মানুষ, যাদের বেঁচে থাকা মানেই প্রতি পদে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা, তাদের কাছে ও ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আমরা মনুষ্যত্ব মানে বুঝি, হয় বাঁচো, না হয় মরো। তুমি বেশ ভাল মেয়ে লীনা, দেখতেও চমৎকার। এমন একটা সুন্দর মেয়ের এরকম পরিণতি আমি চাই না। কিন্তু কিছু করার নেই। গুড বাই...

লীনা কিছু বলার আগেই লোকটা চকিতে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে এক লাফে দরজায় পৌঁছেই চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল লীনা। এভাবে মরবে ববি? এরকমভাবে কি ওকে মরতে দেওয়া যায়? ওর কত ভুল যে শুধরে দেওয়ার আছে লীনার

ক'মিনিটের ফিউজ? লোকটা বলল, দু'মিনিট, ববিও সেরকমই যেন কিছু জানিয়েছিল তাকে। মাত্র দুমিনিট। লাল বোতামটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভে চলে গেছে সংকেত। যেখানে অপেক্ষারত এক শক্তিশালী বিস্ফোরক হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে উত্কণ হয়েছে। তার কানে সংকেতটা পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে ব্লু-উ-উ-ম-ম-ম্-ম্...

লীনা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হাতলটা খুঁজল। ওই ঢাকনার তলাতেই রয়েছে সেই উৎকর্ণ বিস্ফোরক। লীনাকে তা অকেজো করতেই হবে। হাতলটা মেঝের সঙ্গে মিশে আছে। লীনা তার লম্বা নখ ঢুকিয়ে দিল খাঁজে। তারপর খুঁটে তুলবার চেষ্টা করল। নখটা উলটে গিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। লীনা গ্রাহ্যও করল না।

হাতলটা উঠে এল ঠিকই। কোলাপসিবল হাতল, মেঝেয় মিশে থাকে, বোঝাও যায় না। হাতলটা ধরে টানতেই ঢাকনাটা সরে এল। হালকা ফাইবারের তৈরি জিনিস, ভারী নয়। আলগা ঢাকনাটা তুলে দূরে ছুড়ে ফেলল লীনা। তারপর গর্তটার মধ্যে নেমে পড়ল।

ঠিক এ সময়ে একজোড়া পা দৌড়ে এল ঘরে।

মিস ভট্টাচারিয়া, আপনি কী করছেন?

লীনা লোকটার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, আপনি ববির বন্ধু না শত্রু?

বন্ধু, ভীষণ বন্ধু! আমি ইন্দ্রজিৎ সেন, প্রাইভেট আই।

তা হলে ছুরি কঁচি যা আছে দিন। ভীষণ দরকার।

এই যে নিন। ছুরি আমার সবসময়ে থাকে। শুধু রিভলভার...

লীনা যে গর্তে নামল তা মোটেই গভীর নয়। তার কাঁধ অবধি বড় জোর। নীচে একটা জটিল যন্ত্র। অনেক তার। অনেক স্ক্রু এবং বল্টু। কী করবে লীনা? সে পাগলের মতো একটার পর একটা তার কেটে ফেলতে লাগল ছুরি দিয়ে।

ঠিক পনেরো সেকেন্ডে ওপরে উঠে এল জন। দরজার বাইরে পা দিয়েই সে দেখল, বিশাল দানবটার সংজ্ঞা ফিরেছে। উঠে বসবার চেষ্টা করছে ঘাসের ওপর।

জন গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। সময় নেই। একদম সময় নেই।

দানবটা উঠে বসল। মাথায় হাত দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল, সে কোথায় এবং তার কী হয়েছে। আর তখনই সে জনকে দেখতে পেল গাড়ির জানালায়।

জন! এই জন!

জন একটু ইতস্তত করল। তারপর কী ভেবে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিল।

জন! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

জনের সময় নেই। অ্যাকসেলেটরে পা দাবিয়ে দিল সে।

দানবটা আচমকাই কুড়িয়ে নিল তার কারবাইন। তারপর নলটা ঘুরিয়ে আধ সেকেন্ডের একটা বা চালু করল। কানে তালা দেওয়ার মতো বাতাসে তরঙ্গ তুলে এক ঝাঁক গুলি গিয়ে উড়িয়ে দিল পিছনের দুটো টায়ার।

জন নেমে এল গাড়ি থেকে, বোকা! গাধা! হোঁতকা!

জনের ডান হাতটা একবার মাত্র একবারই অতি দ্রুত আন্দোলিত হল। বাতাসে শিস আর রোদে ঝলক তুলে গ্লোয়িং নাইফটা ছুটে এল। দানবটা কিছু বুঝে উঠবার আগেই সেটা আমূল, বাঁট পর্যন্ত গেঁথে গেল বাঁ দিকের বুকে। ঠিক যেখানে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান।

লোকটা অবিশ্বাসের চোখে একবার নিজের বুকের দিকে তাকাল।

জন হরিণের পায়ে দৌড়োচ্ছে। পালাবে? দানবটা তার কারবাইন বিবশ হাতে তুলল। লক্ষ্য স্থির নেই, এমনকী চোখেও সে ভাল দেখছে না। তবু ট্রিগার চেপে ধরল সে।

ট্যাট ট্যাট ট্যাট... রা রা রা রা রা করে উজাড় হয়ে যেতে লাগল সাব-মেশিনগান।

সেই ঝাঁকবাঁধা গুলির তোড়ে জন প্রায় দু'-আধখানা হয়ে গেল। উড়ে গেল তার হাতের একটা আঙুল, শরীরের নানা অংশ ছিটকে পড়ল নানাদিকে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই সে বিভক্ত হয়ে গেল শতধা। যখন মাটিতে পড়ল তার অনেক আগেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

দানবটা কয়েকবার হেঁচকি তুলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, আট্টা গুড বয়। ইউ নেভার ডিচ এ ফ্রেন্ড... ওকে?

তারপর দানবটা চোখ বুজল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আর শ্বাস নিতে পারল না।

দৃশ্যটা দেখল একজন। যে ছাদে ছিল। দুটো সাহেবকে একে অন্যের হাতে খুন হয়ে যেতে দেখে সে আর অপেক্ষা করল না। নেমে এল।

মৃত দুই সাহেবের পকেটে হাত দিয়ে সে দুটো ওয়ালেট বের করে নিল। বেশ পুরুষ্টু ওয়ালেট। তারপর হাতের অস্ত্রটা একটা ঝোলায় পুরে নিয়ে সে দ্রুত ফটক পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

'স্যার, স্যার...' বলে কে যেন প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল।

গভীর ঘোরের মধ্যেও সেই ডাকটা ববির কানে পৌঁছোল। খুব ক্ষীণভাবে।

স্যার, আমরা মরে যাচ্ছি... আমরা আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি স্যার, যে আগ্নেয়গিরি এখুনি ইরাপ্ট করবে।

ববির ঘোরটা কাটল। মাথায় হাত দিয়ে তিনি 'ওঃ' বলে কাতর একটা আওয়াজ করলেন। মুখের ওপর একটা চেনা মুখ ঝুলে আছে। ইন্দ্রজিৎ। এত বড় বড় চোখ ইন্দ্রজিতের।

ববি দুর্বল গলায় বললেন, কী বলছ?

রেড বাটন প্রেস করে বদমাশটা পালিয়েছে এক মিনিট হয়ে গেল। কিছু করুন স্যার। দিদিমণি সব তার কেটে ফেলেছেন।

ববি এবার চমকে জেগে উঠলেন, ডেটোনেটর অ্যাক্টিভ! সর্বনাশ! কিন্তু আমি যে—

আপনি উঠবেন না। শুধু বলুন কী করতে হবে?

ববি দেখতে পেলেন, মেঝের চৌকো গর্তের মধ্যে নেমে পাগলের মতো তার কেটে কেটে ওপরে জড়ো করছে লীনা।

ববি চেঁচিয়ে বললেন, লীনা!

লীনা পাগলের মতো চোখে ফিরে তাকাল।

ববি শান্ত স্বরে বললেন, এক্সপ্লোসিভের মাথায় একটা নীল বোতাম আছে। সেটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে প্যাঁচ খুলে টান দিলেই একটা সরু ডার্ট বেরিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি করুন।

ববির দিকে চেয়েই লীনা শান্ত হল। মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছিল, আর পাঁচ সেকেন্ড... চার সেকেন্ড... তিন সেকেন্ড... দুই সেকেন্ড...

লীনা নীল বোতামটা তার ওড়না দিয়ে চেপে ধরে বাঁ দিকে প্রাণপণে মোচড় দিচ্ছিল। একটু ধীরে ঘুরছিল পাঁচ। বড় শক্ত।

আর এক সেকেন্ড...

লীনা একটা টান দিয়ে ডার্টটা বের করে ফেলল।

ইন্দ্রজিৎ কানে আঙুল দিয়ে চোখ বুজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধু বলল, জিরো...

লীনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গর্তটার মধ্যেই।

ইন্দ্রজিৎ কান থেকে হাত নামাল, ঘড়ি দেখল, তারপর দু'হাত তুলে চেঁচাতে লাগল, জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা, জয় বাবা মহাদেব... স্যার, আমি যদিও নাস্তিক, কিন্তু ফর দি টাইম বিয়িং... জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, হর হর মহাদেব...

ববি দু'বার উঠবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তার শরীরের গভীর ক্ষতগুলি টাটিয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে স্নায়ুতন্তুজাল। বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে।

তৃতীয়বার উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ববি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

বাঘিনীর মতো উঠে এসে লীনা উপুড় হয়ে পড়ল ববির ওপর। না, শ্বাস চলছে, নাড়ি চলছে। তবে বড় দ্রুত। ববির গায়ে হাত রেখে লীনা বুঝল, অন্তত একশো দুই তিন ডিগ্রি জ্বর।

অবস্থাগতিক দেখে ইন্দ্রজিৎও ববির কাছে হাঁটু গেড়ে বসল, কেমন বুঝছেন?

এখনই কোনও নার্সিং হোম-এ নেওয়া দরকার।

নো প্রবলেম। চলুন ধরাধরি করে ওপরে তুলি। আমাদের গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করা আছে। আমি চট করে নিয়ে আসব গিয়ে।

দু'জনে একরকম চ্যাংদোলা করে ববিকে ধীরে ধীরে ওপরে নিয়ে এল।

দরজার বাইরে পা দিয়েই যে দৃশ্যটা দেখল দু'জনে তাতে লীনা একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে চোখ ঢাকল। আর ইন্দ্রজিৎ এমন হা হয়ে গেল যে বলার নয়।

লীনার চিৎকারেই বোধহয় ববির জ্ঞান দ্বিতীয়বার ফিরল। ওরা বারান্দায় শুইয়ে দিয়েছিল তাঁকে। তিনি এবার ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। দু'টি রক্তাক্ত দেহ অনেকটা তফাতে পড়ে আছে। এই দৃশ্যটাই সম্ভবত ববির ভিতরে কিছু উদ্দীপনা সঞ্চার করে দিল। তিনি দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

লীনা তখনও চোখ ঢেকে কাঁপছে, টলছে।

ববি অনুচ্চ স্বরে বললেন, লীনা, এরা দুজন বেঁচে থাকলে আমাদের কারও শান্তি থাকত না। এ দেশের সরকারেরও নয়। যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে।

লীনা চোখ থেকে হাত সরিয়ে ববির দিকে তাকাল। চোখ ভরা জল। হঠাৎ এই অবস্থাতেও সে একটু হাসল, আমার নামটা তা হলে মনে পড়েছে আপনার!

ববি চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, পড়েছে। আর ভুলব না।

ইন্দ্রজিৎ বিস্ময় কাটিয়ে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে এল।

ববি মাথা নেড়ে বললেন, এখনই নয়। যাও ইন্দ্রজিৎ, ছাদটা দেখে এসো। ওখানে একজন স্নাইপার মজুত ছিল। যদিও আমার ধারণা সে পালিয়ে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ দৌড়ে ওপরে গেল তারপর ফিরে এসে বলল, কেউ নেই স্যার।

পিছনের বাগানে যে দু'জন পড়ে আছে তাদের একটু খবর নাও। যদি জ্ঞান না-ফিরে থাকে তবে হাত আর পা বেঁধে সেলার-এ ঢুকিয়ে দরজায় তালা দাও।

এসব কাজে ইন্দ্রজিৎ খুবই পাকা এবং নির্ভরযোগ্য। দু'জন সংজ্ঞাহীন লোককে বেঁধে মাটির নীচে একটা অতিরিক্ত ঘরে বন্ধ করে আসতে তার সব মিলিয়ে পঁচিশ মিনিট লাগল।

ববি কলকাতায় এক্স-সার্ভিসমেনদের একটা সিকিউরিটি এজেন্সিকে ফোন করলেন। তারা এসে নীল মঞ্জিলের নিরাপত্তার ভার নেবে এবং দু'জন বন্দিকে তুলে দেবে পুলিশের হাতে। পুলিশকেও তারাই নিয়ে আসবে এখানে।

ববি আর-একটা ফোন করলেন। ট্রাংক কল। দিল্লির প্রতিরক্ষা দফতরে।

লীনা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনার এখনই মেডিক্যাল অ্যাটেনশন দরকার। কলকাতা অনেক দূর। কেন সময় নষ্ট করছেন? আপনার পিঠের জামা রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

ববি লীনার দিকে ঘুম-ঘুম ক্লান্ত চোখে চেয়ে বললেন, ওরা নীল মঞ্জিলের সমস্ত ভার আমাকে দিতে চাইছে।

বিরক্ত লীনা বলল, ওসব পরে শুনব। এখন চলুন।

ববি ধীরে ধীরে হেঁটে গাড়িতে এসে উঠলেন। পিছনের সিটে লীনা তার পাশে বসল। ইন্দ্রজিৎ গাড়ি ছেড়ে দিল।

ববি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ধীরে ধীরে টলতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ রিয়ারভিউ মিররে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল। বলল, শুয়ে পড়ুন স্যার। আপনাকে সাংঘাতিক সিক দেখাচ্ছে। দিদিমণির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ুন। আমি তাকাব না।

রিয়ারভিউ মিররটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রজিৎ।

ববির উপায় ছিল না। শরীরটা আপনা থেকেই গড়িয়ে পড়ে গেল লীনার কোলে।

লীনার শরীরে একটা বিদ্যুৎ বহুক্ষণ ধরে বয়ে যেতে লাগল। শিউরে শিউরে উঠল গা। তারপর ধীরে ধীরে এক প্রগাঢ় মায়ায় সে ববির মুখে হাত বুলিয়ে দিল।

ববি নিস্তেজ গলায় বললেন, কিন্তু ওই যে ভ্যাগাবন্ড– তার কী হবে?

লীনা ফিসফিস করে বলল, দোলন? উই ওয়ার নেভার ইন লাভ। আমরা শুধু গত এক বছর ধরে পরস্পরের প্রেমে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছি মাত্র। কিছু হয়নি। আমরা পারিনি।

আর এবার?

লীনা শিহরিত হল মাত্র। তারপর বলল, আমি কিন্তু আর মিসেস ভট্টাচারিয়া নই।

ববি হাসলেন। তারপর বললেন, হাউ অ্যাবাউট মিসেস রায়?